দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

- হিন্দুর দেবতা ভাঙিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা —পৃঃ ২৩
- নমাজ ছেড়ে চণ্ডীপাঠ তৃণমূল নেত্রীর নতুন রাজনীতি — পৃঃ ২৫

৭১ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা।। ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮।।
১ পৌষ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

রাম বনাম দুর্গা

হিন্দুর দেবতা ভাঙিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকা

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ১৪ সংখ্যা, ১ পৌষ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

১৭ ডিসেম্বর - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

পশ্চিমবঙ্গে এখন হবু-গবুদের রাজত্ব চলছে □ গূঢ়পুরুষ □ ৬

খোলা চিঠি : মোদীজী, সত্যকে মানতেই হবে □ সুন্দল মৌলিক □ ৭

কেরলের শবরীমালা মন্দিরে পুলিশতন্ত্র □ টি সতীসন □ ৮

ভারতের কূটনৈতিক বিচক্ষণতা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করেছে □ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১১

পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকারটুকু নেই □ রঞ্জন কুমার দে □ ১৩

দেশের আসল সাম্প্রদায়িক দল কংগ্রেস □ দেবব্রত চৌধুরী □ ১৫

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলাকারীদের মনোনয়ন দিয়েছে আওয়ামি লিগ □ ১৬

বায়ু হোক প্রাণদায়ী, আয়ু হোক দীর্ঘ □ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১৭

হিন্দুর দেবতা ভাঙিয়ে এবার ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা □ বিজয় আঢ্য □ ২৩

নমাজ ছেড়ে চণ্ডীপাঠ : তৃণমূল নেত্রীর নতুন রাজনীতি □ সনাতন রায় □ ২৫

'আমাদের দুর্গা, ওদের রাম' □ প্রীতীশ তালুকদার □ ২৮

মিত্র সপ্তমী— সূর্যস্নানের একটি নাম □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত □ সলিল গেঁউলি □ ৩৩

অন্য জীবনানন্দ □ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৫

হ্যারিসন রোডের বাঙ্গালি সত্যান্বেষী □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ৩৭

পাকিস্তান প্রীতি কংগ্রেসিদের রক্তে □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ৪১

জেহাদি মৌলবাদের সিঁদুরে মেঘ কেরলের আকাশে □ ড. জিষ্ণু বসু □ ৪৩

যুগাচার্য যবে সন্ন্যাস নিলেন □ শেখর সেনগুপ্ত □ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য: ২২** □

সমাবেশ-সমাচার : ২৯-৩০ □ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** □

চিত্রকথা : ৪০ □ **অন্যরকম : ৪২** □ **রঙ্গম : ৪৯** □

সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৮

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পাঁচ রাজ্যে ভোটের ফলাফল

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই অনেকে বলতে শুরু করেছেন, পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফলের প্রভাব পড়বে ঊনিশের লোকসভা নির্বাচনে। তাদের সিদ্ধান্ত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মারাত্মক চাপে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় বিষয় পাঁচ রাজ্যের ফলাফল। সেই সঙ্গে থাকবে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন যে চরিত্রগতভাবে আলাদা, তাই নিয়ে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিশ্লেষণ। লিখবেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, চন্দ্রভানু ঘোষাল প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিভাজনের নোংরা রাজনীতি

'কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক/কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম/সবিনয়ে সগৌরবে ধরাধামে দুঃখ মহত্তম/কহ মোরে সর্বদর্শী, হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম/নারদ কহিলা ধীরে, অযোধ্যার রঘুপতি রাম।' শ্রীরামচন্দ্র সম্পর্কে এমন শ্রদ্ধাবিনম্র পংক্তিগুলির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীরামচন্দ্র এবং রামায়ণ সম্পর্কে এমন ভক্তিপূর্ণ মনোভাব রবীন্দ্রনাথ বিবিধ রচনাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র সেন রচিত 'রামায়ণী কথা' গ্রন্থের সুদীর্ঘ মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণকে নিছক মহাকাব্যের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া, তাহাকে সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস আখ্যা দিয়াছেন। এই বঙ্গ প্রদেশরই ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস ওঝা বাঙ্গলায় রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। এখনও বঙ্গের গ্রামেগঞ্জে নিত্যদিন শ্রদ্ধা সহকারে রামায়ণ পাঠ হয়। শ্রীরামচন্দ্রকে এখানকার মানুষ আরাধ্য দেবতাজ্ঞানেই পূজা করেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবেই রামায়ণকে কোনও দেশকাল বা জাতি বর্ণের গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন নাই। রামায়ণকে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন—রামায়ণ প্রতিটি ভারতবাসীর। রামচন্দ্রও প্রতিটি ভারতবাসীর। রামচন্দ্র বা রামায়ণকে রাজস্থানি, গুজরাতি, মহারাষ্ট্রীয়, বাঙ্গালি ইত্যাদি বিভাজনে ভাগ করা যায় না। তাহা কাম্যও নহে। শ্রীরামচন্দ্র প্রতিটি ভারতবাসীরই আরাধ্য দেবতা। ভারতবর্ষের জাতীয় পুরুষ।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য ইহা মানিতে চাহেন না। সম্প্রতি একটি সভায় তিনি বলিয়াছেন, ওদের (অর্থাৎ সঙ্ঘ-বিজেপি) রাম আছেন, আমাদের আছেন দুর্গা। ইতিপূর্বে এই ধরনের অর্থহীন আশ্চর্যজনক কথা কেহ বলিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। অবশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরনের অর্থহীন কথা কহিতেই অভ্যস্ত। এইবারেও সেই অর্থহীন কথারই বেসাতি সাজাইয়া বসিয়াছেন। এই ধরনের কথাবার্তার পিছনে মুখ্যমন্ত্রীর অবশ্য অন্যরকম দুরভিসন্ধি রহিয়াছে। রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আসা ইস্তক মুখ্যমন্ত্রী নির্লজ্জ মুসলমান তোষণের নজির গড়িয়াছেন। তাঁহার এই অন্যায্য এবং অন্যায় তোষণের রাজনীতি বাঙ্গালি হিন্দুর আবেগে আঘাত দিয়াছে। বাঙ্গালি হিন্দু তাহার প্রতি ক্রমশই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তৃণমূলেশ্বরী ইহা উপলব্ধি করিতেছেন, মুসলমান তোষণের রাজনীতি তাঁহাকে আর পতন হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। ফলত, তিনি এখন হিন্দু সাজিবার ভড়ং ধরিয়াছেন। দিল্লিতে রাহুল গান্ধী যেমন উপবীত ধারণ করিয়া নিজেকে দত্তাত্রেয় গোত্রের ব্রাহ্মণ প্রমাণে সচেষ্ট হইয়াছেন, তেমনি এই রাজ্যেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেছেন, তিনি প্রকৃত হিন্দু। আর কেহ হিন্দু নয়।

কিন্তু এইসব ভড়ংয়ের রাজনীতি ধরিয়া ফেলিতে রাজ্যের মানুষের দেরি হয় নাই। হিন্দুর ভেক ধরিয়া 'ওদের রাম আমাদের দুর্গা' ইত্যাকার অর্থহীন কথাবার্তা বলিয়া প্রকারান্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে হিন্দুদের ভিতর বিভাজন করিতে চাহিতেছেন—ইহা সকলেই বোঝেন। দেবীপক্ষ শুরুর আগেই যিনি প্রতিমার চক্ষুদান করিবার মতো অশাস্ত্রীয় কর্মটি করেন—তিনি কেমন হিন্দু তাহা বুঝিতে বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন হয় না। যিনি মুসলমানের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য দুর্গা পূজার বিসর্জনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন—তিনি প্রকৃতই হিন্দুর হিতাকাঙ্ক্ষী কিনা—তাহা লইয়াও সংশয় বাঙ্গালি হিন্দুর মনে রহিয়াছে। আসলে ভোট বড় বালাই। আর এই কারণেই তোষণের রাজনীতির পাশাপাশি এখন বিভাজনের নোংরা রাজনীতিটিও করিতে শুরু করিয়াছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুভাষিতম্

উদ্যমেন বিনা রাজন্ ন সিধ্যন্তি মনোরথাঃ।
কাতরাঃ ইতি জল্পন্তি যদ্‌ভব্যম্ তদ্ ভবিষ্যতি।।

পরিশ্রম ছাড়া মনের ইচ্ছা সফল হয় না। যা হবার তা হবে—এরকম কথা ভীতু প্রকৃতির লোকেরাই বলে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে এখন হবু-গবুদের রাজত্ব চলছে

রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে। সেই কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রশাসন বিজেপির কোচবিহার-কলকাতা রথযাত্রা বাতিল করেছিল। অদ্ভুত কথা। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, তাঁর পুলিশ-প্রশাসন এতটাই ঠুনকো যে গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন বিরোধীরা করলে রাজ্যে শান্তি রক্ষা সম্ভব হবে না। সোজা কথায় মুখ্যমন্ত্রী শক্ত হাতে প্রশাসন চালাতে ব্যর্থ। মুখ্যমন্ত্রী জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক করে বলছেন, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া বীরভূমে অবৈধ বালির খাদান রমরম করে চলছে। পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা ঘুমিয়ে আছেন। মাফিয়ারা হপ্তা দিয়ে তৃণমূল দলের জেলা নেতৃত্বকে কিনে নিয়েছে। তোলাবাজ দুষ্কৃতীদের দাপটে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত। চোলাই মদের ঠেক্ ভেঙে দিতে বললেও পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। পুলিশ কথা শুনছে না। দলে সিন্ডিকেটের বখরার লড়াই চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিটি কথাই সত্যি। পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। এরপরেও তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কুরশিতে বসে আছেন কেন? গণতন্ত্রে বিরোধী দলের মিছিল, সমাবেশ, রথযাত্রা ইত্যাদি করার সাংবিধানিক অধিকার আছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। সরকার আইনের শাসন রক্ষা করতে পারবে না তাই বিরোধীরা শান্তিপূর্ণভাবে গণ-আন্দোলন করতে পারবে না। আজব যুক্তি। পশ্চিমবঙ্গে এখন হবু-গবুদের রাজত্ব চলছে।

সকালবেলায় খবরের কাগজের পাতা খুললে শুধুই খুন, জখম, ধর্ষণের খবর। স্কুলপড়ুয়াদের কন্ডোম ব্যবহারের পাঠ দেওয়া হচ্ছে। গত ৯ ডিসেম্বর, রবিবার তৃণমূল দলের কট্টর সমর্থক 'সংবাদ প্রতিদিন' খবরের কাগজ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলে বোঝা যাবে দিদির রাজ্য এখন কেমন চলছে। এই কাগজটির (৯ ডিসেম্বর) দ্বিতীয় পাতার খবর, 'কলকাতার উল্টোডাঙায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর তাণ্ডব। ব্যাডমিন্টন নিয়ে সংঘর্ষ। আহত শিশু মহিলা। বাড়ি ভাঙচুর। হাওড়ার শিবপুরে দুষ্কৃতী তাণ্ডব। চলল গুলি, বোমাবাজি। টাকিতে ইকোটুরিজম পার্কে শুটআউট। ওই দিনের কাগজের তৃতীয় পাতায় খবর, 'নদিয়ায় কালীগঞ্জে রাতে বাড়ি ফেরার পথে খুন তৃণমূল, যুব নেতা।' সাতের পাতায় 'দুই মেয়েকে নিয়ে ভাগীরথীতে মরণঝাঁপ মায়ের।' একই পাতায় প্রধান খবর, 'রাস্তার উপর প্রতিবাদীকে গলা কেটে খুন।' 'বাবার হাতে খুন ছেলে'।

কলকাতার কট্টর বিজেপি বিরোধী বাংলা দৈনিক 'এই সময়' (৯ ডিসেম্বর, রবিবার) প্রথম পাতায় লিখেছে, 'রথ নেই, তবু অপবিত্র পথে তৃণমূলের গঙ্গাজল'। দ্বিতীয় পাতার খবর, হাওড়া স্টেশনে যন্ত্রণার রোজনামচা। পাঁচের পাতার খবর, এক পলিটেকনিক ছাত্রের দেহ উদ্ধার বহরমপুরের জলঙ্গিতে। উত্তর

গূঢ় পুরুষের

কলম

দিনাজপুরের দাড়িভিট স্কুলে বন্ধ পরীক্ষা। আটকে গেল উচ্চমাধ্যমিক টেস্টের ফল প্রকাশ। সাতের পাতার খবর, লোকসভা ভোটের আগে জনসংযোগ বাড়াতে এবার পাড়ায় পাড়ায় বড়দিনের কেক খাওয়াবেন তৃণমূল নেতারা। 'মেয়ে হওয়ায় আছড়ে খুন দুধের শিশুকে, ভাতারে ধৃত বাবা'। নয়ের পাতায় খবর, 'প্রোমোটিং বিবাদে শিবপুরে গ্রেপ্তার তৃণমূল কাউন্সিলারের স্বামী।' কাগজের ১২-র পাতায়, 'কয়লার উনুন আর রাস্তার ধুলো বিষ ছড়াচ্ছে কলকাতার বাতাসে'। আনন্দবাজার পত্রিকার 'কলকাতা' পাতায় খবর, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিধাননগর মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান বয়কট চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা চক্রবর্তীর।

মাত্র একটা দিনের প্রভাতী দৈনিকের কিছু খবরের ঝলক থেকে বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে দিদির নেতৃত্বে বাংলা ও বাঙালি কতটা পিছিয়েছে। সিপিএম ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার সুবাদে রাজ্যকে নরক করেছিল। আমরা চেয়েছিলাম পালা বদলের পর কর্মসংস্কৃতি ফিরে আসুক। বাংলা বাঁচুক। কিন্তু তা হয়নি। সিপিএমের অতীত পার্টি সংস্কৃতির সঙ্গে তৃণমূলের হিংসার বর্তমান সংস্কৃতির পার্থক্য দেখছি না। বাংলার উন্নয়ন নয়, দিদির লক্ষ্য এখন বিজেপিকে নিকেশ করা। তাঁর কথাবার্তা শুনলে মনে হয় বিজেপিকে বাংলা ছাড়া করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিজেপি একটি স্বীকৃত সর্বভারতীয় দল। কেন্দ্রে ক্ষমতায় আছে। তৃণমূল আঞ্চলিক দল। একমাত্র বাংলায় তার পরিচিতি। কিন্তু নেত্রী এমনভাবে ভাষণ দিচ্ছেন যে তিনি ইচ্ছা করলেই প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পারেন। 'মোদী দাঙ্গাবাজ। আমি বাংলায় ঢুকতে দেব না।' ওগো আমার শোলোক বলা দিদিভাই, এমন ক্ষমতা দেশ এবং সংবিধান কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দেয়নি। দিদিভাই দেশের সংবিধানটা ভালো করে পড়ুন। তারপর লম্বাচওড়া ভাষণ দেবেন। ■

সাংবাদিক চাই

স্বস্তিকা পত্রিকায় অসম এবং ত্রিপুরার খবরের অভাব অনেকদিন ধরেই আমরা অনুভব করছি। আমরা মনে করি ওই দুই রাজ্যে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের জীবনধারণের প্রকৃত ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের কাছে তুলে ধরা দরকার। তাই, ত্রিপুরার আগরতলা এবং উত্তর অসমের শিলচরের যুবক-যুবতীদের প্রতি আমাদের আবেদন, নিউজ রিপোর্টিংয়ে যদি কারও আগ্রহ থাকে তাহলে অবিলম্বে নীচে দেওয়া ঠিকানায় এক কপি পাসপোর্ট-সাইজ ছবি-সহ সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জি পাঠান। জীবনীপঞ্জি ই-মেলও করা যেতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য ফোন করুন সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বরে।

স্বস্তিকা

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

Email : swastika 5915@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বর : ৮৪২০২৪০৫৮৪

মোদীজী, সত্যকে মানতেই হবে

মাননীয় নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী, ভারত সরকার

দেশ আপনাকে ক্ষমতায় এনেছে। দেশ আপনার দলকে ক্ষমতায় এনেছে। পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফল দেখার পরেও জানবেন দেশ আপনার সঙ্গেই রয়েছে। আপনি যে সংস্কারমূলক কাজ করেছেন তার ফল দীর্ঘমেয়াদি। একেবারে আম জনতার কাছে তার সুবিধা মিলতে আরও সময় লাগবে। স্বচ্ছ অর্থনীতি থেকে স্বচ্ছ ভারত সবই দেশের জন্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু কোনও কিছুই যে সাধারণের আবেগের চেয়ে বড় নয়। এই সত্যটা মেনে নেওয়ার সময় এসেছে মোদীজী।

ভিক্ষে চাইছি না। গোটা একটা দেশের আবেগ। অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি নিয়ে সরকারের কাছে এটাই দাবি সাধারণ মানুষের। এই দেশে কেউ কোনও দিনও পজিটিভ ভোটে জিততে পারেনি। অর্থশক্তি, পেশিশক্তি আর নেগেটিভ ইস্যুতে ভর করেই সবার জয় এসেছে। এই প্রবণতা গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর। আপনি ও আপনার দল তার বদল আনতে চাইছেন বলে সাধুবাদ অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু সত্যটা মেনে নিতেই হবে যে, সবার জন্য ঘর, সবার জন্য কাজ, সবার জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দিয়েই শুধু হবে না। এই দেশ এখনও অতটা বড় হয়নি। আপনি যে চেষ্টা করছেন তার ফল একদিন দেশ পাবেই পাবে। একদিন বুঝতেই পারবে এই সংস্কার সুফল। কিন্তু বিরোধী শক্তির বারবার বলে যাওয়া মিথ্যা সত্যকে চাপা দেবেই।

আপনার বিদেশ সফরের সুফল দেশ পাবে, কিন্তু দেশের মানুষের কাছে বিরোধী প্রচারে সেটা শুধুই ভ্রমণ। আপনার আমলে কালোটাকার কারবার, নগদ অর্থনীতির দুর্নীতি বন্ধ হয়েছে। তার প্রভাব বাজারে পড়েছে। অসাধু ব্যবসায়ীদের কালো দিন সুবিধা করে দিচ্ছে অসাধু রাজনীতিকদের। এটা পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। সাংগঠনিক ত্রুটি, দুর্বলতা বিচার করবেন আপনারা। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে আপনার ভালো কাজের প্রভাব যেদিন স্পষ্ট হবে সেদিন পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

সামনে ২০১৯ সাল। সাধারণ নির্বাচন। কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক এখনও গোটা দেশ আপনাকেই চায়। সাধারণ মানুষ চায়, যাঁর হাত ধরে দেশে তালাক বেআইনি হয়েছে, তাঁর হাত ধরেই অযোধ্যায় ভব্য মন্দির গড়ে উঠুক শ্রীরামের। এ তো ন্যায্য দাবি। এতো ভিক্ষে চাওয়া নয়। তবে সিদ্ধান্ত নিতে এত সঙ্কোচ কেন! কেন সর্বোচ্চ আদালতের দিকে তাকিয়ে থাকা! এ তো আপনার প্রতিশ্রুতি ছিল! সেই সত্যকে তো মানতেই হবে। আর পাঁচটা ভালো কাজের পাশাপাশি এই পুণ্য কাজটিও যে করতেই হবে।

আপনাকে একবার মনে করিয়ে দিতে চাই কয়েকদিন আগে আর এস এস-এর সর্বভারতীয় সরকার্যবাহ ভাইয়াজি যোশীর বক্তব্য। তিনি বলেছেন, ‘‘আজ যাঁরা ক্ষমতায় তাঁরা কথা দিয়েছিলেন যে, অযোধ্যায় রামের মন্দির নির্মাণ করা হবে। তাঁদের উচিত দেশের মানুষের দাবি মেনে অযোধ্যায় মন্দির তৈরি করা। আমরা ভিক্ষা চাইছি না। আমরা আমাদের আবেগ প্রকাশ করছি। দেশ ‘রাম-রাজ্য’ প্রতিষ্ঠা চায়। মন্দির নির্মাণ তারই একটা পদক্ষেপ।’’

এর আগে সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবতও একই কথা বলেছেন। বিজয়া দশমীর ভাষণে সরসঙ্ঘচালক স্পষ্ট করেই বলেছেন— ‘‘রাম কেবল হিন্দুদের নয়, বরং গোটা দেশের। আত্মসম্মানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে রামমন্দির নির্মাণ জরুরি। রামমন্দির নির্মাণ হলে দেশে সদ্ভাবনার পরিবেশ তৈরি হবে।’’ মোহন ভাগবত আরও বলেন, বাবর রামমন্দির ধ্বংস করে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত করেছে। রাম মন্দির তৈরি নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। এটা দুর্ভাগ্যের। এখনই রাম মন্দির নির্মাণ হওয়া উচিত।

সময় কম। ২০১৯ আর দূরে নয়। এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে যে ফল তাতে সেই বড় প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থতাও বড় কারণ। এই সত্যটা মানতেই হবে। আদালত মানুষের আবেগের বিচার করতে পারে না। সেই বিচার করতে হয় মানুষের সরকারকে। সত্যটা মানতেই হবে।

—সুন্দর মৌলিক

কেরলের শবরীমালা মন্দিরে পুলিশতন্ত্র

টি সতীসন

কেরল পুলিশের আই জি বিজয় শামারে এবং এস-পি ইয়াতিম চন্দ্রকে ভক্তদের ওপর অসম্মানজনক ব্যবহারের জন্য তীব্র তিরস্কার করল কেরল উচ্চ আদালত। পুলিশ আধিকারিকরা যে আইন নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছেন সে বিষয়টাও আদালতের নজর এড়ায়নি।

মন্দির চত্বরে ১৪৪ ধারা জারি থাকার বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগের শুনানি চলাকালীন কেরল সরকারের শবরীমালা মন্দির সংক্রান্ত নীতি ও কাজকর্মকে কাঠগড়ায় তুলল উচ্চ আদালত। এই সূত্রে আদালত সরাসরি জানতে চায়, সেখানে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার কি কোনও ঘটনা ঘটেছে? জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নিরোধক আইনটি জারি করা সংক্রান্ত সমস্ত ফাইল বিশদে তাঁর এজলাসে পেশ করার আদেশও দেন তিনি। একই সঙ্গে আদালত দর্শনার্থীদের 'শরানম' ধ্বনি দেওয়া ও বিগ্রহ দর্শনে সমস্ত বাধা অপসারিত করার নির্দেশ দিয়ে দর্শনার্থীরা যাতে একা বা দলবদ্ধ হয়েও দেবস্থানে প্রবেশ করতে পারে তার নির্দেশ দেন। নিজেদের প্রার্থনা জানানোর সঙ্গে মন্দির এলাকার নির্দিষ্ট স্থানে বিশ্রাম ও শয়ন করার পূর্ণ অধিকারও তাঁদের থাকবে। মাঝরাতে তীর্থযাত্রীদের ঘুম ভাঙিয়ে তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক জ্বলন্ত উদাহরণ ও মৌলিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। সরকার যে দু'জন আই পি এস আধিকারিককে মন্দিরের নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োগ করেছে তাঁদের বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারি মামলা রয়েছে। বিজয় শামারে পাল্লাকাড জেলায় থাকাকালীন সম্পত নামে এক ব্যক্তির পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর অভিযোগে অভিযুক্ত। ইয়াতিম চন্দ্রের বিরুদ্ধে গরিব, নিরস্ত্র নারী ও শিশুদের ওপর নৃশংস লাঠি চালানোর অভিযোগে মামলা রয়েছে। এই ঘটনাটি তিনি কোচিতে থাকাকালীন ঘটে। বিশেষ করে এই দু'জন পুলিশ কর্তার, চলতি কথায়, বডি ল্যাঙ্গোয়েজের মধ্যে কোনও বিনয় বা ভব্যতার লেশমাত্র নেই। আদালত সন্দেহ প্রকাশ করে বলে আলোচ্য আধিকারিকরা কি ডিজিপি-র দেওয়া মালায়লামে লেখা সার্কুলারের মানে বুঝতে পারেননি? কেননা, ঐ নির্দিষ্ট ইউডিএফ দলের বিক্ষোভকারীরা তাদের কর্মসূচির আগাম নোটিশ কর্তৃপক্ষকে যথাসময়েই দিয়েছিল যে তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে। সেক্ষেত্রে কি এটাই ধরে নিতে হবে যে, তারা ভিড় সামলানোর ক্ষেত্রে পেশাগতভাবে ব্যর্থ! বিরক্ত বিচারপতি কেরল সরকারকে সংশ্লিষ্ট দুই আইপিএস সংক্রান্ত বিশদ রিপোর্ট দিতে বলেছেন। নির্দিষ্ট করে আদালত পুলিশের তরফে ১৪৪ ধারা জারি করার কারণ জানানোর আদেশ দিয়েছেন। এই মর্মে আদালত ১৩০ জন দর্শনার্থীকে যাদের মধ্যে নারী শিশুরাও ছিল কেন বিগ্রহ দর্শন ছাড়াই ফিরে যেতে হলো তার কৈফিয়তও তলব করেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে পুলিশের হেনস্থা

কেন্দ্রীয় অর্থ ও জাহাজ প্রতিমন্ত্রী রাধাকৃষ্ণন নীলাক্কল অঞ্চলে (শবরীমালার প্রবেশদ্বার) গেলে আই পি এস ইয়াতিম চন্দ্রের কাছে অপদস্থ হন। পুলিশকর্তা মন্ত্রীকে বলেন, তাঁর সঙ্গে আগত কোনও গাড়িই মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বার অবধি যাওয়ার অনুমতি পাবে না। তাঁর নিজের গাড়িই শুধু যেতে পারবে। মন্ত্রী এমন অদ্ভুত আদেশের কারণ জানতে চাওয়ায় তাঁকে জানানো হয়, কেরল সরকারি পরিবহণের গাড়ি ছাড়া অন্য কোনও গাড়িই নীলাক্কালের আগে যেতে পারবে না। কেননা, সেক্ষেত্রে যান চলাচলে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটবে।

পুলিশ কর্তার স্পর্ধা এতদূর যায় যে, তিনি সরাসরি মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন যে তিনি কি এই ধরনের পরিস্থিতির দায় নেবেন? অজস্র টিভি ক্যামেরার ঝলকানির সামনে সরকারি প্রোটোকলের এমন তছনছ হয়ে যাওয়া বিরল দৃষ্টান্ত। শুধু তাই নয়, ওই আধিকারিক চোখে রোদচশমা পরা অবস্থায় সিনেমার কায়দায় মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি?' ওই আই পি এস অফিসারের ব্যবহারে তিনি সন্দেহাতীতভাবে বুঝিয়ে দিতে চাইছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের নিযুক্ত উর্দির অন্দরে তিনি এক জবরদস্ত গুন্ডা। পূর্বোক্ত নিরস্ত্র জনতার ওপর হিংস্র লাঠি চার্জের মানবাধিকার মামলা চলাকালীন একটি সাত বছরের শিশু তাকে শনাক্ত করে বলে ওঠে, হ্যাঁ, এই লোকটাই আমার ভাইকে পিটিয়েছিল। এই ঘটনার অভিঘাতের কথা আদালত বারবার তুলে ধরে।

এখানেই শেষ নয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অপমানের পালা আর একটু বাকি ছিল। দর্শন করে ফেরার পথে পুলিশকর্মীরা আচমকাই তাঁর গাড়ি আটকায়। কারণ তারা নাকি ভি আই পি হিসেবে মন্ত্রীকে চিনতে পারেনি। সরকারি প্রচলিত আচরণবিধির এমন উপর্যুপরি উল্লঙ্ঘন অতি বিরল ঘটনা। দপ্তরের পক্ষে পরবর্তী সময়ে দায়সারাভাবে ভুল স্বীকার করে নেওয়া হয়।

ভক্তদের ওপর মধ্যরাতের অভিযান

নভেম্বরের ১৮ তারিখে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বিশাল ভক্ত সমাগম হয়। 'ভালিয়ানাদাপানডাল'-এ (বিশেষ পূজনের স্থান) জড়ো হয়ে পুলিশের খামখেয়ালি নির্দেশ উপেক্ষা করে তারা দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ শুরু করে দেয়। পুলিশ তাদের প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করতে বলে। ভক্তের দল জানায়, প্রার্থনা কেবলমাত্র আরও রাতে মন্দির বন্ধের সময় 'হরিভরসনম' সমাপ্তি হলে তবেই থামবে। সেই অনুযায়ী মন্দির বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এসে এর্নাকুলাম থেকে আসা রাজেশ নামে এক উদ্যোগী যুবককে গ্রেপ্তার করে। রাজেশ উপস্থিত সংবাদ মাধ্যমকে জানায়— সরকার ও তার পুলিশবাহিনী হিন্দুদের প্রকাশ্যে অপমান করছে। এরপর পুলিশ নাগাড়ে ৭০ জনকে গ্রেপ্তার করে।

সি পি এমের দুমুখো নীতি

লক্ষণীয় হল, 'নিলাক্কল' এলাকায় কংগ্রেস নেতৃত্বের ইউ ডি এফ যখন ১৪৪ ধারা অমান্য করে পরিণামে তাদের ওপর কোনও পুলিশি ক্রিয়াকলাপ হয়নি। এই বিক্ষোভকারীর সংখ্যা ছিল ৫৫। পুলিশের তরফে তাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার খবর নেই। চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করে সেই একই এস-পি ইয়াতিম চন্দ্রের নেতৃত্বে সেই একই পুলিশ বিজেপির সম্পাদক কে সুরেন্দ্রণ যখন চিরাচরিত প্রথা মেনে একটি বিশেষ পুজোর জন্য আসেন তখনই পূজা শুরুর আগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আদালতে তাঁর ১৪ দিনের হেফাজত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি মাত্র ৩ জন সঙ্গী নিয়ে এসেছিলেন। এর মধ্যে হিন্দু ঐক্য বেদী সংস্থার সভাপতি শশীকলা টিচার বিশ্রামরত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। উল্লেখ্য, তিনিও সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে ইকমুদী পূজা অনুষ্ঠান করতে এসেছিলেন। জামিন পাওয়ার পর তাঁকে দেবস্থানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু আইনের আদেশ পেলেও কেরল সরকারের নাছোড় দারোগা তাঁকে নিষ্কৃতি

দিল না। মন্দিরে যাওয়ার বাসে উঠলেও ওই ইয়াতিম চন্দ্র নামের দারোগা বাসে উঠে তাঁর ওপর চড়াও হন। ভদ্রমহিলা সঙ্গের ছোট ছোট নাতি-নাতনিদের দেখিয়ে বলেন, এদের 'চরোনু' নামের এক বিশেষ পূজাপাঠের জন্যই তিনি পবিত্র মন্দিরে যাচ্ছেন। তবুও দারোগার তড়পানি থামেনি।

দেবতা আয়াপ্পার নামে মন্ত্রোচ্চারণে নিষেধাজ্ঞা

নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে পুণ্যার্থীরা যখন বিগ্রহ দর্শনের উদ্দেশে রওনা হন তখনই পুলিশের তথা সরকারের তরফে লিফলেট বৃষ্টি করা হলো। লিফলেটে ফতোয়া দেওয়া হলো--- ১) তারা কেউ যেন স্বামী স্বরনামায়াপ্পার নামে ধ্বনি না দেন, ২) কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও মিডিয়ার সঙ্গে কথা না বলে, ৩) নিলাক্কলের বিগ্রহ অধিষ্ঠিত স্থান থেকে যেন তারা ৬ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসে, ৪) আরও একটি চরম নির্দেশ রয়েছে--- তারা যেন কখনোই সঙ্ঘবদ্ধভাবে চলাফেরা না করে, এমনকী পুজো প্রার্থনাও না করে।

এরপর ২০ নভেম্বর পুলিশ বহু সংখ্যক ভক্তকে গ্রেপ্তার করে ও তাদের মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। এই ঘটনার পর বিজেপি সাংসদ নলিনী কুমার কাত্তিল এবং ও. ভি. মুরলীধরণ স্থানীয় থানায় গিয়ে পুলিশের ডিজি এবং ডিএসপি-র সঙ্গে ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। পুলিশ কী পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখার প্রতিশ্রুতি দেয়।

বর্বরতা বন্ধ হোক, নাহলে বিক্ষোভ চলবে : হুঁশিয়ারি ভি এইচ পি-র

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক বিভাগের যুগ্ম সম্পাদক ড. সুরেন্দ্র জৈন এই সূত্রে দিল্লিতে বলেছেন যে, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী নৃশংস আদিল শা বা ঔরঙ্গজেবের মতো আচরণ করছেন। তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী হিন্দু বিশ্বাস ও পরম্পরার মূলে কুঠারাঘাত করে তাকে ধ্বংস করে দিতে চান। তিনি কাশ্মীরের মতো কেরলকেও হিন্দুশূন্য করতে চাইছেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে ঢাল করে মুখ্যমন্ত্রী বারংবার হিন্দুদের ওপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছেন।

এই সূত্রে সি পি এমকে সাবধান করে দিয়ে ড. জৈন বলেন, 'এখন পর্যন্ত এই আন্দোলন কেরলের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে, রাজ্য সরকার যদি এই ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক ও গোঁড়া মনোভাব দেখানোয় অটল থাকেন সেক্ষেত্রে এই বিক্ষোভকে সারা দেশব্যাপী আন্দোলনে পরিণত করতে পরিষদ তৈরি থাকবে।' ■

রম্যরচনা

একটি কলেজ পড়ুয়া মেয়ে চশমার দোকানে গেছে চশমা কিনতে। কোনও চশমাই পছন্দ হয় না। দোকানদার গলদঘর্ম। শেষ পর্যন্ত ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় একটি চশমা পছন্দ করল মেয়েটি। এবার দরদামের পালা। দোকানদার যে দাম বলছে, তাতে মেয়েটি কিছুতেই রাজি নয়। একঘণ্টা দর কষাকষির পর দোকানদার কিছুটা দাম কমাতে মেয়েটি চশমা নিতে রাজি হলো। দোকানদারও খুশি অনেক চেষ্টার পর চশমা বিক্রি করতে পেরে। দোকানদার মেয়েটিকে বলল— ম্যাডাম তাহলে চশমার দামটা দিন। চশমাটা প্যাক করে দিচ্ছি। মেয়েটি মুচকি হেসে বলল— দাঁড়ান, এই চশমাটা পরে একটা সেলফি তুলে আগে ফেসবুকে দিই। কজন লাইক করে দেখে নিই। তারপর তো চশমা নেব...

* * *

ডাক্তারের বিয়ে। বরযাত্রী যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সে। মালা বদল হচ্ছে স্টেথোসস্কোপে। সরবত আর কফির বদলে আপ্যায়ন করা হচ্ছে ও আর এস আর গ্লুকন ডি-তে। বিয়ের ভোজে ভিটামিন সি আর ক্যালপল ৬৫০। মজা হলো তখনই, যখন বর বউকে সম্বোধন করলেন 'সিস্টার' বলে।

উবাচ

"সংসদে আইন পাশ করেই রামমন্দির নির্মাণ করতে হবে। এছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই।"

ভাইয়াজী যোশী
সরকার্যবাহ, আর এস এস

দিল্লিতে ধর্মসংসদের সভায় বক্তব্যে

"কাশ্মীরের নেতারা কথায় কথায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলার ব্যাপারে সক্রিয়। তারা উপত্যকায় কথায় কথায় নিরাপত্তা বাহিনীর দিকে আঙুল তোলেন।"

জিতেন্দ্র সিংহ
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

কাশ্মীরের রাজনৈতিক অবস্থা প্রসঙ্গে

"আগামীদিনে পরিস্থিতি এমন হতে পারে যেখানে ভারত ও আমেরিকাকে যৌথভাবে ময়দানে নামতে হলো। তাই ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই এই মহড়া অত্যন্ত উপযোগী।"

জে এস মান
ভারতীয় বায়ুসেনার এয়ার কমেন্ডার

সম্প্রতি ভারত-আমেরিকার যৌথ বায়ুসেনা মহড়া প্রসঙ্গে

"মানবাধিকার সংগঠনের ভয়হীন ভাবে কাজ করা উচিত। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা উচিত যে, সত্যিই মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনও ঘটনা ঘটেছে কিনা।"

কেশরীনাথ ত্রিপাঠী
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে বক্তব্য প্রসঙ্গে

"যতই ক্ষমতাশালী হোন, দুর্নীতিতে কাউকে ছাড় নয়। যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির অভিযোগ পাওয়া যাবে, তাদেরকে তদন্তের মুখোমুখি হবেই হবে।"

শাহনওয়াজ হোসেন
বিজেপি নেতা

রবার্ট বঢড়া ইস্যুতে কংগ্রেসকে

ভারতের কূটনৈতিক বিচক্ষণতা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করেছে

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হলো কেন্দ্রীয় সরকারের কূটনৈতিক বিচক্ষণতা এবং অভ্যন্তরীণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা একত্রিত হয়ে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দারুণভাবে মজবুত করে তুলেছে। আমাদের দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও চীন এক অদ্ভুত মিত্রতার দ্বারা আমাদের শঙ্কিত করে তুলেছিল। পাকিস্তান তিনবার ভারতের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল। আর চীন ১৯৬২ সালে অতর্কিতে আমাদের ওপর আক্রমণ হেনেছিল। পাকিস্তান সুবিধা করতে না পারলেও চীন সেবার আমাদের দেশের অনেকটাই দখল করে নিয়েছে। এই দুটো দেশই পরমাণু শক্তিধর। সেই কারণেই ভারতের দরকার ছিল সামরিক প্রস্তুতি ও মিত্র-সঞ্চয়। মোদী সরকারের বিচক্ষণতা ও তৎপরতার ফলে উভয় ক্ষেত্রেই বিরাট সাফল্য এসেছে। আমাদের মেকি বুদ্ধিজীবী ও স্বার্থসর্বস্ব নেতারা এটা বুঝতেই পারেননি। প্রথমত, এবারের ব্রিক্স সম্মেলনে ভারতের বিরাট জয় হয়েছে। সদস্য রাষ্ট্ররা (রাশিয়া, ব্রাজিল, চীন, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা) সারা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের তীব্র নিন্দা করেছে যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে। এটা সবাই জানেন যে, সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর হলো পাকিস্তান। এই কারণে গত বছর গোয়ায় ব্রিক্স সম্মেলনে ভারত এই প্রস্তাব নিতে চাইলেও চীনের আপত্তিতে সেটা সম্ভব হয়নি। এবার কিন্তু চীনও এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তার ফলে চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে একটু দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, জাপানের সঙ্গে নানা বিষয়ে আমাদের অনেকগুলো চুক্তি হয়েছে। তবে তাৎপর্যের বিষয় হলো, তার মধ্যে পারমাণবিক গবেষণা ও সহযোগিতার ব্যাপারও আছে। মনে রাখতে হবে, জাপান আগে শর্ত দিয়েছিল এই গবেষণাকে শুধু কল্যাণমূলক কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। ছয় বছরের টানাপোড়েনের পর এবার জাপান শর্তটা তুলে নিয়েছে। তার ফলে এই মহাশক্তিধর দেশের কাছ থেকে পারমাণবিক বিষয়ে সবরকম সাহায্য পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, ভারতই একমাত্র দেশ যে জাপানের কাছ থেকে এই ধরনের নিঃশর্ত সাহায্য পেল।

তৃতীয়ত, উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ভারত ইজরায়েলকেও অত্যন্ত কাছে

পেয়েছে। দুঃখের বিষয়, ১৯৪৮ সালে আরব অঞ্চলে আবির্ভূত ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েলকে ভারত কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে চায়নি দীর্ঘদিন। এর পেছনে ছিল আরব দেশগুলো ও রাশিয়াকে খুশি করা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই তাঁর 'ইন মাই ভিউ' বইতে লিখেছেন, 'It is incumbent upon us to recognise Israel'। অনেক দেরিতে (১৯৯২) ভারত তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু ঘনিষ্ঠ হয়নি।

অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে মোদী সরকার এবার এই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক তৈরি করেছে এবং তার সাহায্যে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে তুলেছে। ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের অনেকগুলো চুক্তি হয়েছে--- আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও পারমাণবিক বিষয়ে। এর ফলে আমাদের পারমাণবিক শক্তিও অনেকটাই বেড়ে যাবে। বিশেষ করে, তার কাছ থেকে 'স্পাইক মিসাইল' কেনার চুক্তি হয়েছে। এগুলো ৮০০ মিটার থেকে ৮ কিলোমিটার দূরত্বের লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে পারে। এই ধরনের ৫০০ মিসাইল কেনা হবে। কিছু তৈরি হবে হায়দরাবাদে। তাছাড়া 'বারাক-৮' ক্ষেপণাস্ত্রও ভারত কিনছে ২৭.৭৩ কোটি টাকায়। আগের বছর ২০০ কোটি টাকার চুক্তি করে ভারত ওই দেশ থেকে সেনাবাহিনীর জন্য ক্ষেপণাস্ত্র কিনেছিল, এগুলো উঠবে ভূমি থেকে আকাশে।

চতুর্থত, বিস্ময়ের বিষয়, আমেরিকা তার দীর্ঘদিনের ভারত- বৈরিতার নীতি ত্যাগ করে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। সম্পর্কটা দীর্ঘদিন ধরেই ছিল জটিল। আসলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ক্রমে রুশ-মার্কিন দ্বন্দ্ব জটিল হয়ে পড়েছে। যুযুধান দুই শিবির। এভাবে জন্ম নিয়েছে দুই মেরুর (bi-polar) রাজনীতি। ভারত তার বাইরে থেকে জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করলেও তার একটু রুশ-ঘেঁষা ঝোঁক ছিলই। অথচ তার চিরশত্রু পাকিস্তান মার্কিন শিবিরে যোগ দিয়েছে। তাই ভারত-মার্কিন সম্পর্ক মধুর হয়নি। প্রথমদিকে বরং আমেরিকা পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য করেছে, কাশ্মীর প্রশ্নেও ভারতের বিপক্ষে গিয়েছে। অবশ্য তার চীন-বৈরিতার কারণে ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধে আমেরিকা ভারতকে বাঁচিয়েছে। অসিত সেন লিখেছেন, 'American military aid and air-umbrella was at once assured to India to check the tide of the Chinese aggression'--- (ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস্, পৃঃ ৬১১) কিন্তু তারপর দুই দেশ আবার দূরে সরে গিয়েছিল।

এবার কিন্তু আমেরিকাও কাছে এসেছে। আমেরিকা-সহ সব দেশ পাকিস্তানকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছে। এমনকী চীনও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নানাভাবে ভারতকে সামরিক সাহায্য দিয়েছে।

এবার চুক্তি অনুসারে, ভারত তার কাছ থেকে পেয়েছে ২০টি ড্রোন, তাতে আমাদের নৌ-শক্তি হয়ে উঠবে অপ্রতিরোধ্য। এগুলো ৫০ হাজার ফুট ওপরে উঠে একটানা ২৭ ঘণ্টা উড়তে পারে। এছাড়া শত্রু হটানোর জন্য আমেরিকা ভারতকে 'সুরক্ষা বলয়' তৈরি করে দিয়েছে, যাতে তার ওপর বিমানহানা দেওয়া যায় না। এর জন্য ৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে ঠিকই, কিন্তু তাতে যে কোনও ক্ষেপণাস্ত্রকে ঠেকানো যাবে। তাছাড়া ভারত ৬টা 'এ এইচ -৬৪' হেলিকপ্টারও কিনেছে।

পঞ্চমত, ভারত ফ্রান্সের সঙ্গেও কিছু চুক্তি করেছে নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য।

ষষ্ঠত, আরও বড়ো কথা হল, ভারত রাশিয়ার কাছ থেকেও বিরাট সাহায্য পেয়েছে। ভারত তার কাছ থেকে কিনেছে ৪০ হাজার কোটি টাকার মিসাইল। তার ফলে চীন ও পাকিস্তান চলে এসেছে লক্ষ্যভেদের আওতায়। এতে আতঙ্কিত হয়েছে এই দুই দেশ।

সপ্তমত, চীন ব্রহ্মপুত্রের ওপর বাঁধ তৈরি করতে চায়। এতে বাংলাদেশও ভারতের মতো প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাছাড়া ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনকে রুখতে ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে জোট গঠন করেছে। তার মধ্যে আছে ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স, মালয়েশিয়া, ব্রুনেই, তাইওয়ান ইত্যাদি দেশ। সিঙ্গাপুরের সঙ্গেও নরেন্দ্র মোদী ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা, নেপাল, নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি দেশের সঙ্গে গড়ে উঠেছে সখ্য।

কিন্তু শুধু সফল কূটনীতি ও সাহায্যপ্রাপ্তি নয়, ভারতের লক্ষ্য এখন সামরিক স্বয়ম্ভরতা। আগেই ভারত তৈরি করেছিল 'বৈজয়ন্ত ট্যাঙ্ক'। আর এখন পরমাণু অস্ত্রবাহী 'অগ্নি' ক্ষেপণাস্ত্রও তৈরি করেছে। এটা ৫০০০ কিমি দূরের লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানতে পারে। এই বছরেই ভারত তিনবার 'সুপারসনিক মিসাইল' নিয়ে সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। আরও লক্ষণীয়, সম্পূর্ণ হয়েছে আই এন এস অরিহন্ত। এই সাবমেরিন এখন শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় প্রস্তুত। এর দ্বারা সমুদ্রপথে যাতায়াত এবং অস্ত্র ব্যবহার করা সহজ হবে।

পাকিস্তান ভারতের চিরশত্রু ঠিকই, কিন্তু চীন কয়েক শতাব্দীর মৈত্রীকে অস্বীকার করে ভারতের ২৫০০০ বর্গমাইল জমি দাবি করেছিল— (ভি এল খান্না, ফরেন পলিসি অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১১৩)। আর চীন ১৯৬২ সালে হঠাৎ আক্রমণ করেছিল এই দেশকে। সেটা ছিল আকস্মিক military offensive'--- (কে বি কেশওয়ানি - ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, পৃঃ ৫৮০)।

এই অবস্থায় দরকার সামরিক প্রস্তুতি ও কূটনৈতিক বিচরক্ষণতার সঙ্গে মিত্র সংগ্রহ। বিশেষ করে, তাকে অস্ত্রসজ্জিত হতেই হবে। এম. ক্লিমেন্টের ভাষায় 'We have to do, no their alternative' (ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, পৃঃ ২৯৩)। হার্টব্রানের মতে, বিদেশনীতির লক্ষ্যই হলো দেশের স্বার্থ রক্ষা করা (রিলেশনস অ্যামং নেশনস্, পৃঃ ২৫২)।

মোদী সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কূটনীতিকে অভ্যন্তরীণ গবেষণার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে দেশকে শক্তিশালী করে তুলেছেন। ■

পাকিস্থানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকারটুকু নেই

রঞ্জন কুমার দে

ভারত এবং পাকিস্তান একদিনের ব্যবধানে স্বাধীন হলেও পার্থক্য অনেক। পাকিস্তান একটি গণতান্ত্রিক দেশ হলেও সেখানে প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা আর সেনা প্রধান সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ সহ বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত মৃতপ্রায় দেশটিকে টেনে তুলতে প্রত্যেক নির্বাচিত সরকারকেই হিমশিম খেতে হয়। ২২গজে দাপট দেখানো ১৯৯৩-এর ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী ইমরান খান রাজনৈতিক দল তেহরিক-ই-ইসলাম বানিয়ে প্রধানমন্ত্রিত্বের শিরোপা লাভ করেন। ইসলামি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্লোগানে তাঁর 'মিশন পাকিস্তান' হলেও বাস্তবে কঠিন সমস্যার মুখে। একদিকে সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি, পরোক্ষ সামরিক শাসন, তারমধ্যে ঘোর অর্থনৈতিক সমস্যা। বিশ্বত্রাস লাদেনকে আশ্রয় ও মদত দিয়েছিল পাকিস্তান, আর্মি ক্যাম্পের কয়েক ক্রোশ দূরে লাদেনকে আবিষ্কার করা হয়েছিল। মাসুদ আজহার, হাফিজ সাইদদের মুক্ত বিচরণ ভূমি পাকিস্তান। পাকিস্তান সন্ত্রাস দমনের নাম করে পরোক্ষভাবে জঙ্গিদের মদত দিয়ে চলেছে। তাই ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন ৩০০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ২১০০ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্যের অনুদান রদ করে নবনির্বাচিত ইমরান সরকারকে জোর ধাক্কা দেন। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক স্বীকার করেছে দেশটির প্রায় ৯৩টি মাদ্রাসায় জঙ্গি যোগ রয়েছে। তাই অর্থনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বেজিং, সৌদি, দুবাইয়ে ঝুলি নিয়ে ঘুরছেন। সম্প্রতি সৌদির প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোহম্মদ বিন সলমনের দাবি পাকিস্তানিরা নাকি ধর্মান্তরিত ক্রীতদাস মুসলিম।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্ট্র্যাটেজিক ফোরসাইট গ্রুপের এক রিপোর্ট অনুসারে মানবতার পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ পাকিস্তান। কুখ্যাত আইসিসের আঁতুরঘর সিরিয়ার চাইতেও নাকি তিনগুণ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মাদ্রাসায় কচি মনে বপন করা হচ্ছে ঘৃণার বীজ। সীমান্তের ওপ্রান্তে প্রতিনিয়তই ঘটছে সংখ্যালঘুদের প্রকাশ্যে ধর্ম পরিবর্তন, নাবালিকা অপহরণ, ধর্ষণ, খুন সহ অনেক কিছু। প্রত্যেকটি ঘটনা আন্তর্জাতিক মিডিয়ার শিরোনামে না এলেও কয়েকটি ঘটনা খুবই পীড়াদায়ক। সম্প্রতি 'আসিয়া বিবি' যার প্রকৃত নাম আসিয়া নাসরিন অসহায় এক পাকিস্থানি ক্রিস্টান মহিলা। ধর্মের ছোঁয়াচে রোগে মৌলবাদীদের রক্তচক্ষু। দেশটির নিম্ন আদালত আসিয়া বিবির মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করলেও সঠিক তথ্য প্রমাণের অভাবে সুপ্রিম কোর্ট আসিয়াকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে। মূল ঘটনার সূত্রপাত ২০০৯ সালে। আসিয়া বিবি এবং তার প্রতিবেশীরা গাছ থেকে ফল পাড়ছিলেন। তখন এক বালতি জল নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়। আসিয়া একটি কাপে করে ওই বালতির জল খেয়েছিলেন। যেহেতু তিনি অমুসলিম, তাই ওই জল তিনি স্পর্শ করতে পারেন না। এমনটাই প্রতিবেশীদের অভিযোগ। কারণ ওই জল নাকি অপবিত্র হয়ে গেছে। তাই বাদীপক্ষ আসিয়াকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হওয়ার নিদান দেয়, এমনকী তাকে বাড়িতে গিয়েও মারধর করা হয়। আসিয়ার বিরুদ্ধে সবচেয়ে

বড় অভিযোগ তিনি নাকি ইসলামের নবি হজরত মহাম্মদকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আসিয়া বিবি বারবার তা অস্বীকার করেছেন এবং সুপ্রিম কোর্টে তা প্রমাণিতও হয়েছে।

কিন্তু পাকিস্তানি উগ্র মৌলবাদী শক্তি সুপ্রিমকোর্টের রায়ে মোটেই খুশি নয়। ইমরান খান প্রথমে রক্তচক্ষু দেখালেও এখন নতমস্তক। বাধ্য হয়ে দেশে হিংসা, বিক্ষোভ বন্ধ রাখতে উগ্র ইসলামপন্থী সংগঠন তাহরিক-ই-লাবাইকের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারকে এক সন্ধি স্থাপন করতে হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে আসিয়া বিবিকে কোনভাবেই দেশের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। উল্লেখ্য, আসিয়া বিবি ভুয়ো ব্লাসফেমি আইনে এমনিতেই গত দশ বছর ধরে জেলে বন্দি। ছোট্ট মেয়ে মাকে না দেখতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এখন তাঁর সম্পূর্ণ পরিবার প্রাণসংকটে। তাঁর স্বামী ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডা, জার্মান সহ একাধিক দেশে সপরিবারে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছেন। দেশগুলিও যথেষ্ট সাড়া দিয়েছিল কিন্তু ধর্মীয় উগ্রবাদীদের সঙ্গে সরকারের নতুন চুক্তিতে প্রত্যাবর্তন ব্যবস্থাও সম্ভবপর হয়ে উঠছে না।

পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ১.৬ শতাংশ খ্রিস্টান। ১৯৯০ সাল থেকে এই ব্লাসফেমির অভিযোগে খ্রিস্টান সহ মোট ৬৫ জনকে পাকিস্তানে হত্যা করা হয়। কোনও বিশেষ ধর্মের বিষয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করাকে 'ব্লাসফেমি' বা ধর্ম অবমাননাকর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কোনও কোনও দেশে 'এপোস্ট্যাসি'কে ব্লাসফেমির বিকল্প হিসেবে ধরা হয়। এপোস্ট্যাসির মাধ্যমে বিশেষ কোনও ধর্মকে অস্বীকার করা বা স্বধর্ম ত্যাগ করাকে বোঝানো হয়।

ব্লাসফেমি আইন শুধু ইসলামিক দেশে কার্যকরী নয়, বরং ইউরোপের অনেক দেশে আইনটির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। ব্লাসফেমি আইনে ধর্ম অবমাননা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও অনুরূপ আচরণকে চরম অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যুক্তরাষ্ট্রের 'কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম'-এর এক রিপোর্ট অনুসারে বিশ্বের ৭১টি দেশে এই কুখ্যাত ব্লাসফেমি আইন কার্যকরী আছে। তবে বিশেষত ইসলামিক দেশগুলোতে ব্লাসফেমি আইনের অনুশীলন হওয়ায় প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। পাকিস্তান ছাড়াও ইরান, সৌদিআরব, এবং মৌরতানিয়ার ব্লাসফেমি আইনে অনেক মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় প্রতিহিংসা মেটাতে এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করতে এই 'ব্লাসফেমি' আইনকে হাতিয়ার বানানো হয়। পাকিস্তানভিত্তিক এক মানবাধিকার সংস্থা আমেনস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাদের ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলে পাকিস্তানে ব্লাসফেমি আইনের ভুক্তভোগীরা অধিকাংশই অমুসলিম। তারা ভুয়ো ঘটনার শিকার। ইউরোপের দেশগুলি অনেক মুক্তমনা, সুশিক্ষিত হলেও এই ব্লাসফেমি আইনের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো ঃ—

*ডেনমার্ক—কোরান পোড়ানোর একটি ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করার অপরাধে ২০১৭ সালে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্লাসফেমি আইনে অভিযোগ আনা হয়।

*জার্মান—'কোরান, পবিত্র কোরান' লেখা টয়লেট পেপার বিলি করায় ২০০৬ সালে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়।

*ফিনল্যান্ড—ইসলাম বিষয়ে একটি ব্লগ পোস্টে অবমাননাকর মন্তব্য করায় ২০০৯ সালে এক ব্যক্তিকে জরিমানা করা হয়।

*জার্মানি—গাড়িতে ক্রিস্টান বিরোধী স্টিকার লাগানোর দায়ে ২০১৬ সালে এক ব্যক্তিকে ৫০০ ইউরো জরিমানা করা হয়।

*আয়ারল্যান্ড—টিভি অনুষ্ঠানের ব্রিটিশ কমেডিয়ান স্টিফেন ফ্রাইয়ের এক মন্তব্যের কারণে অভিযোগ আনা হলে তদন্ত চলে তার উপর।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয়—আইসল্যান্ড, নরওয়ে, মানটাও সম্প্রতি এই কুখ্যাত ব্লাসফেমি আইন বাতিল করেছে। আরেকটি ইউরোপীয় দেশ আয়ারল্যান্ড গণভোটে ব্লাসফেমিকে আইনের পেছনের দরজা দিয়ে বের করে দিয়েছে। প্রতিবেশী বাংলাদেশে একটি কট্টর ইসলামিক সংগঠন ২০১৩-র ঢাকায় একটি বিশাল সম্মেলনে ১৩ দফার দাবিতে 'ব্লাসফেমি' আইন কার্যকরী করার দাবিকে প্রধান হিসাবে রাখা হয়। দেশটিতে ব্লাসফেমি কার্যকরী না থাকলেও ইসলামের অবমনানার অভিযোগে কট্টরপন্থীরা প্রকাশ্যে অনেক নাস্তিক, ব্লগার, কলামিস্টদের প্রকাশ্যে রাস্তায় জবাই করেছে; যার মধ্যে একটিরও সুবিচার হয়নি। রাজন দাস, টিটু রায়দের কীভাবে ভুয়ো ধর্ম অবমাননার দায়ে ফাঁসানো হয়েছিল বিশ্ববাসী আজও সাক্ষী। বাংলাদেশের নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন তথাকথিত এই ধর্ম অবমাননার দায়ে দেশান্তরী। মালালা ইউসুফের জন্য পাকিস্তানের উগ্রবাদ একবার সবার নজরে এসেছিল, আজ আসিয়া বিবির কল্যাণে বিষাক্ত ব্লাসফেমি আইনকে সবাই জানতে পারছে। ধর্ম অবমাননার দায়ে শুধু অভিযুক্তের প্রাণ সংশয়ে থাকে না, বরং তাদের শুভকাঙ্ক্ষীরাও কট্টরবাদীদের চোখে অপরাধী।

আসিয়া বিবির আইনজীবী প্রাণভয়ে অনেক আগেই বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। আসিয়া বিবিকে নৈতিক সমর্থন করায় পঞ্জাবের গভর্নর সালমান আসিরকে হত্যা করা হয়। তার ঘাতক মুমতাজ কাদিরকে ফুল বর্ষণ করে আদালত প্রাঙ্গণে বীরের সম্মান যারা দেয় তাদের অধিকাংশই শিক্ষিত আইনজীবী। একইভাবে অতীতে ধর্মান্ধতায় এক খুনির হয়ে আদালতে সওয়াল করছিলেন মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ। তখন ইসলাম নিয়ে ধর্মীয় বই রঙ্গিলা রসুল প্রকাশ করার অপরাধে প্রকাশক রাজপাল খান্নাকে খুন করা হয়েছিলো। 'ব্লাসফেমি' বা 'ঈশ্বর নিন্দা' আইন এমন জঘন্য যে আপনি 'মোহম্মদ' নামের কোন ব্যক্তিকে গালি দিলেও আপনি এই ব্লাসফেমি আইনের আওতায় এসে যাবেন। পাকিস্তানের সংবিধানে ইসলামে বিশ্বাস রেখে শপথ নিতে হয়। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী জায়েদ হামিদ এই শপথ গ্রহণে সামান্য সংশোধনী চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশের মোল্লা, মুয়াজ্জিন, আলিম ব্রিগেড প্রতিবাদে পুরো দেশকে স্তব্ধ করে দেয়। অবশেষে শ্রমমন্ত্রী ক্ষমা চেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

ব্লাসফেমি আইনের স্বরূপ গবেষণা করে সহজে পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের করুণ অবস্থার অনুমান করা যায়। পাকিস্তানের মহান সংসদে দাঁড়িয়ে একজন হিন্দু সাংসদ লাল চন্দ মালহী আক্ষেপের সুরে বলেন তাঁরই কিছু মুসলিম বন্ধু সাংসদ তাকে 'গোরুর পূজারি', 'হিন্দু-হিন্দু' বলে বিদ্রূপ করেন। মায়ানমার, সিরিয়া, ফিলিস্তিনিতে অমানবিক কিছু ঘটলে সারা পৃথিবীর মানবাধিকার সংস্থা জেগে উঠে, আক্ষেপ হয় এই পাকিস্তানি সংখ্যালঘুদের জন্য। পাকিস্তানে সংখ্যালঘু যুবতীদের প্রথমে অপহরণ করা হয়, তারপর বিয়ে এবং ধর্মান্তরকরণ। ১৬ বছরের রবিতা মেঘারকে প্রথমে অপহরণ করা হয়, তারপর জোরজবরদস্তি ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করে নাম দেওয়া হয় গুলনাজ শাহ। এরকম ঘটনা প্রতিদিন পাকিস্তানে ঘটছে। রিঙ্কল কুমারী নামের এক হিন্দু যুবতীকে ২০১২ সালে ধর্মান্তরিত করার পর মামলাটি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। বি জে পি সরকার পাকিস্তান থেকে আগত ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার সংখ্যালঘুদের কয়েক দফায় দীর্ঘ মেয়াদি ভিসা প্রদান করে। কিন্তু আইনের মারপ্যাচে এরকম শরণার্থীদের অনেক সময় এতো তাড়াতাড়ি ভিসা দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তাই বছরখানেক আগে প্রায় ৫০০ জন হিন্দু শরণার্থীর পাকিস্তান ফেরাতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাদের কপালে দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করছিল, তাদের ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা হয়। এদের মধ্যে ৮০ বছরের বৃদ্ধ চন্দু সাংবাদিকদের বলেন এখন আর তাদের মেয়েকে ধর্ষিতা হতে হবে না, বিনামূল্যে তারা পাবে এক বছর চাষের জল, মেয়ের বিয়ের সামগ্রী, সেলাই মেশিন প্রভৃতি। অযোধ্যায় এক বাবরি ধাঁচা ভাঙার মাশুল পাকিস্তানের কটি মন্দির দিয়ে গুনতে হয়েছিল শুধু সেখানকার হিন্দুরাই জানে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভৌগোলিক স্বাধীনতা হয়তো পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বাঁচার অধিকার পায়নি। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর প্রতিনিয়ত নিপীড়ন সুস্পষ্টভাবে একথাই প্রমাণ করছে। ■

দেশের আসল সাম্প্রদায়িক দল কংগ্রেস

দেবব্রত চৌধুরী

ভারতের বর্তমান প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই ভারতীয় জনতা পার্টিকে সাম্প্রদায়িক দল বলে প্রচার করে। বলে বিজেপি ভারতে একমাত্র হিন্দু দল বলেই গুরুত্ব পাবে, অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীদের কোনও সম্মান বা অস্তিত্ব জানতে দেওয়া হবে না। কিন্তু বাস্তব হলো ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি নয়, আসল সাম্প্রদায়িক দল হল কংগ্রেস। তার যথেষ্ট কারণ আছে। ভারতীয় জনতা পাটি তথা জনসঙ্ঘ দল প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই এই সম্বন্ধে 'Nehru A Troubled Legecy' বইয়ে Sri R. N. P. Singh (Ex. CBI officer) বিস্তারিত ভাবে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কয়েকটি ঘটনা এই লেখায় উল্লেখ করা হচ্ছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে আচার্য নরেন্দ্র দেব একজন ভারত বিখ্যাত নেতা। তিনি স্বাধীনতার সময়ে একজন সমাজবাদী নেতা ছিলেন। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে অযোধ্যা-ফৈজাবাদ কেন্দ্রে একটি উপ-নির্বাচনে সমাজবাদী দলের প্রার্থী হন। জওহরলাল নেহরু ব্যক্তিগতভাবে নরেন্দ্রনাথ দেবকে সহ্য করতে পারতেন না, অথচ নরেন্দ্র দেব মহাশয়ের যোগ্যতা-দেশপ্রেম-জনসেবা সেই সময় ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু নরেন্দ্র দেবের জনপ্রিয়তা উত্তরপ্রদেশে জওহরলালের যন্ত্রণার কারণ হলেও কোনও কংগ্রেস নেতা নরেন্দ্র দেবের বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাড়াতে রাজি হলেন না। নেহরু পরিচালিত কংগ্রেস তখন উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়া অঞ্চলে সাধু পরিষদে জানালেন নরেন্দ্র দেব হিন্দু ধর্মকে গুরুত্ব দেন না। তাঁর দলের ভাবনা হিন্দু বিরোধী, তাঁকে কোনমতেই জিততে দেওয়া উচিত হবে না। আপনারা একজন সাধুকে দাঁড় করিয়ে দিন—আমাদের কংগ্রেস দল পূর্ণ সমর্থন দেবে। আরও বলা হলো, অযোধ্যা হিন্দু দেবতা রামচন্দ্রের জন্মভূমি, তাই এক রামভক্ত সাধুকে দাঁড় করানো উচিত। নেহরুর প্ররোচনায় সাধু পরিষদ এক সাধুকে দাঁড় করিয়ে দিলে নরেন্দ্র দেবের বিরুদ্ধে, যে মাত্র কয়েক দিন আগে কংগ্রেস ত্যাগ করে নেহরুর একনায়কতন্ত্রের জন্য। অন্য এক উদাহরণে লেখা হয়েছে, ১৯৪৮ সালে মতপার্থক্য হওয়ার জন্য কংগ্রেস সভাপতি আচার্য জে বি কৃপালনি কংগ্রেস দল থেকে ইস্তফা দেন। নেহরু ও তার বশংবদরা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিলেন। জে বি কৃপালনী নির্দল হয়ে উত্তরপ্রদেশে আমরাজী কেন্দ্রের নির্বাচনে দাড়ালেন। তাকে হারাবার জন্য নেহরু মুসলিম সম্প্রদায়ের সাহায্য নিলেন। নেহরুজী মুসলিম মৌলানার কেন্দ্রে দেওবন্দ এবং মুসলিম তীর্থস্থান আজমির শরিফকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। কারণ আমেথি কেন্দ্রে ৩৭% (শতাংশ) ভোটদাতা ছিলেন মুসলিম। তারা নেহরু তথা কংগ্রেসের অনুপ্রেরণায় মুসলিম ভাইদের আদেশ করলেন ইসলাম রক্ষার্থে জে বি কৃপালনীকে যেন ভোট দেওয়া না হয়। মুসলিম সম্প্রদায় সবরকম সাহায্য করে ২২% ভোটে কৃপালনীকে পরাজিত করলেন ১৯৬২ সালের নির্বাচনে। ১৯৫৭ সালে পার্লামেন্ট নির্বাচনে কেরলে সি. পি. আইকে হারাবার জন্য নেহরু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাহায্য চাইলেন কংগ্রেসকে ভোটে দেওয়ার জন্য। কোট্টায়মের বিশপকে দিয়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কাছে আদেশ পাঠালেন যাতে সব খ্রিস্টান যেন কংগ্রেসকে ভোট দেয়। ১৯৬২ সালে নেহরুর বন্ধু সৈয়দ মামুদের সাহায্য নিলেন। তাকে দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে বলালেন ভারতবর্ষে একমাত্র কংগ্রেস রাজই মুসলিমদের নিরপত্তা দিতে পারে, অন্য কোনও রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এলে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা নিরাপত্তাহীন হবে।

এমনকি উত্তরপ্রদেশের বিখ্যাত মুসলিম নেতা জাকির হোসেন সাহেবও নেহেরুর এই পরিবর্তন মেনে নিতে পারেননি। কারণ ভারতের সংবিধান মেনে নিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষাতায় কোনও বিশ্বাসই নেই। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায় গর্ব ছিল ছিলেন হুমায়ুন কবির। তাঁর আদি বাড়ি ফরিদপুর, কিন্তু শিক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁকে ১৯৬২ সালে লোকসভায় আনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত বসিরহাট কেন্দ্রকে বেছে নিল কংগ্রেস। তাদের ধারণা হল কবির সাহেব মুসলমান, হয়তো কলকাতা শহরবাসী বেশিরভাগ হিন্দু তাকে ভোট দেবে না। এদিকে হুমায়ুন কবির আজাদ সাহেবের সেক্রেটারি ছিলেন। তার পরিবারবর্গ ভাইরা সবাই কলিকাতায় থাকতেন। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বাংলা বিভাজনের আগে যেখানে অমুসলমান নেতাকে কংগ্রেস প্রার্থী করত সেখানে কংগ্রেস ১৯৫২ সালে মুসলমান প্রার্থীকে দাঁড় করালো। যুক্তি হলো ওই এলাকায় মুসলমান ভোটার বেশি, তাই অমুসলমান ব্যক্তিকে দাঁড় করবে না। কংগ্রেস নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ দল বলে প্রচার করে। কিন্তু আসলে মুসলিম লিগের মতন ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। জওহরলাল নেহরু হিন্দুদের শুধু বলতেন 'ধর্ম নিরপেক্ষতা আমাদের নীতি'। কিন্তু মুসলিম সম্পর্কে তিনি এই নীতি মানা জরুরি মনে করতেন না। হায়দরাবাদ সম্বন্ধে দেশের গৃহমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল যখন কঠোর নীতি গ্রহণের প্রস্তাব দেন, জওহরলাল প্যাটেলকে লিখেছিলেন "Muslim of Hyderabad should have weightage on the ground the Hyderabad had been hundred percent of Muslim state". 'জওহরলাল-নুন' চুক্তি অনুযায়ী জওহরলাল পাকিস্তানকে দিয়ে দিলেন বেরুবাড়ি কিন্তু এ ব্যাপারে জওহরলাল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সাথে কোনও আলোচনা করলেন না। ∎

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলাকারীদের মনোনয়ন দিয়েছে আওয়ামি লিগ

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ কোনো নির্বাচনে যদি সংখ্যালঘুরা বলে, অমুক অমুক সাংসদ বা রাজনৈতিক নেতা আমাদের ওপর অত্যাচার করেছেন, মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করেছেন, বাড়িঘর দখল করেছেন, জায়গা-জমি কেড়ে নিয়েছেন, মন্দিরে হামলা করেছেন---যার কারণে সংখ্যালঘু অনেক পরিবার দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে, তাঁদের মনোনয়ন দেওয়া যাবে না। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে দল নেতৃত্ব দিয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী বলে পরিচিতি আছে, সে দলই যদি তাদের নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়, তাহলে সংখ্যালঘুরা কী করবে? বিশেষ করে এই দলের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে যখন সংখ্যালঘুরা বিবেচিত?

ঠিক এই অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমাজ, বিশেষ করে হিন্দুরা। সংখ্যালঘুরা সেই পাকিস্তানি আমল থেকে আওয়ামি লিগের সঙ্গে আছে। পঞ্চাশের দশকে কংগ্রেস ছিল পূর্ব বাংলায়। পৃথক নির্বাচনে কংগ্রেস থেকে প্রাদেশিক পরিষদে ৭২ জন সদস্য নির্বাচিত হন। পরে হিন্দুরা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ত্যাগ করে আওয়ামি লিগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। সেই থেকেই তারা আওয়ামি লিগের কট্টর সমর্থক। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামি লিগের সঙ্গেই তাঁরা রয়েছে। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর সীমিত পর্যায়ে যে প্রতিবাদ হয় তারও পুরোভাগে ছিল হিন্দু ছাত্ররা। জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করার পর সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানি ধারার রাজনীতির সূচনা হয়। ইসলামি ধারায় দেশশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেনানিবাসে বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন জিয়াউর রহমান। ভারতবিদ্বেষ ও ইসলামি রাজনীতিকে দলের মুখ্য আদর্শ করেন তিনি। স্বাভাবিকভাবে গোড়া থেকেই হিন্দুরা বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে।

আওয়ামি লিগকে ভোট দিয়ে সংখ্যালঘুরা বারবার অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়েছে। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি বিপুলভোটে বিজয়ী হয়ে জামায়াতে ইসলামিকে সঙ্গে নিয়ে দেশজুড়ে হিন্দু সমাজের ওপর যে ভয়াবহ নির্যাতন-নিপীড়ন চালায়, তার দুঃসহ স্মৃতি এখনও ম্লান হয়ে যায়নি। ম্লান হয়নি ২০১৪ দশম জাতীয় সংসদের নির্বাচন রুখতে বিএনপি জামায়াত হিন্দু সমাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুই হামলাই হয়েছিল আওয়ামি লিগের ভোটব্যাঙ্ককে উচিত শিক্ষা দিতে। অর্থাৎ আওয়ামি লিগকে ভোট দিলে এভাবেই অত্যাচারিত হতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দুরা আওয়ামি লিগের পাশে দাঁড়ায়।

দশ বছরে আওয়ামি লিগের দু'দফা ধারাবাহিক শাসনে অবশ্য কিছু হলেও মোহভঙ্গ হয়েছে। কারণ গত দশ বছরে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু সমাজের ওপর যেভাবে হামলা হয়েছে, জায়গা-জমি-বাড়িঘর জবরদখল হয়েছে এবং যথারীতি দেশত্যাগ করতে হয়েছে তার সিংহভাগের জন্য দায়ী আওয়ামি লিগ সাংসদ তথা নেতারা। শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়ে লাভ হয়নি। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এসব নেতা ও সাংসদকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল। একটা তালিকাও করা হয়েছিল, এই তালিকাটি তুলে দেওয়া হয়েছিল আওয়ামি লিগের শীর্ষ নেতৃত্বের হাতে। তালিকার শীর্ষে যে নামটি ছিল তার নাম খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেয়াই। মেয়ে পুতুলের শ্বশুর। তালিকা নিয়ে ঐক্য পরিষদ নেতাদের কয়েক দফা আলোচনা হয় আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর কাদের ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমামের সঙ্গে। তারা দুজনেই আশ্বাস দিয়েছিলেন, এসব সাংসদ ও নেতারা কিছুতেই মনোনয়ন পাবেন না। তবে এক নম্বর নামের ব্যাপারে তারা কিছু করতে পারবেন না। আওয়ামি লিগের মনোনয়নপ্রাপ্ত নেতাদের তালিকা দেখেই হতাশ ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন ঐক্য পরিষদ নেতারা। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকারী, জবরদখলকারী সব সাংসদ নেতা মনোনয়ন পেয়েছেন। আওয়ামি লিগ বলেই ক্ষুব্ধ সংখ্যালঘু নেতারা। তারা এই মনোভাব গোপন রাখেননি। আরেক বড় দল বিএনপির কাছে তাদের প্রত্যাশা নেই। কারণ গোড়া থেকেই এই দলটি ইসলামি রাজনীতি করে জামায়াতকে নিয়ে।

বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বলেছেন, সাম্প্রদায়িক ও বিতর্কিত ব্যক্তিরা মনোনয়ন পেয়েছেন। এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এতে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, আমরা আওয়ামি লিগ ও আওয়ামি লিগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের কাছে বারবার অনুরোধ জানিয়েছি, এসব নেতাদের মনোনয়ন দেবেন না। আমাদের সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এসব ব্যক্তি মনোনয়ন পেলে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা ঐসব এলাকায় ভোটদানে বিরত থাকবে।

এছাড়া আমাদের কোনো বিকল্প নেই। ঐক্য পরিষদ উদ্বিগ্ন এ কারণে যে, এসব ব্যক্তি আবার নির্বাচনে জয়ী হয়ে এলে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবেন। হিন্দুদের দেশত্যাগ নতুন মাত্রা লাভ করবে। আওয়ামি লিগ নেতাদের জিজ্ঞাসা করা হলে তারা কেউ জবাব দেননি। আকারে-ইঙ্গিতে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় এদের আবার মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। আওয়ামি লিগে হাসিনার বিরুদ্ধে কথা বলেন এমন কেউ নেই। ▌

বায়ু হোক্ প্রাণদায়ী, আয়ু হোক্ দীর্ঘ

গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় তিনপক্ষকাল ধরে সারা ভারত দেবীপক্ষ পালন করল। এই সময়কালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আদ্যাশক্তি পূজিতা হলেন দুর্গা, বিন্ধ্যবাসিনী, লক্ষ্মী, কালী, মহালক্ষ্মী, ষষ্ঠী (ছট্), জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি রূপে। বিহার ও উত্তর প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দুর্গাপূজার সময়ে চিরাচরিতভাবে প্রতিবছরের মতো পূজিতা হলেন ভারতমাতা। এই সময়কালের মধ্যেই কার্তিকী অমাবস্যায় পালিত হল দীপাবলী।

কার্তিকী অমাবস্যা তিথিতে বাংলায় কালীপুজো বা পশ্চিম ভারতে মহালক্ষ্মীপুজো যাই হোক্ না কেন সেই অমানিশি সর্বত্রই আলোকিত হয় দীপালোকে। বলা হয় শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দবছর বনবাসের অন্তে রাবণবধ করে সীতাদেবীকে নিয়ে কার্তিক অমবস্যা তিথিতে সপারিষদ অযোধ্যায় ফিরেছিলেন। আনন্দবিহ্বল অযোধ্যাবাসীরা সেদিন নিজেদের বাসগৃহ দীপমালায় আলোকিত করে তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলেন। এ বছরে অযোধ্যাবাসীরা দীপাবলীর রাত্রে তিন লক্ষ মাটীর প্রদীপ জ্বালিয়ে সরযূনদীর তীরকে সাজিয়ে গিনেস্ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে।

বর্ত্তমানে সেই দীপোৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আতশবাজি। কবে থেকে যে আতশবাজি দীপাবলির অঙ্গ হয়ে উঠেছে জানা নেই। চীনদেশে বারুদ আবিষ্কৃত হলেও বাবরের সময়েই ভারতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম বারুদ ব্যবহৃত হয়। হয়তো তারাই সোরা, গন্ধকের সঙ্গে নানা খনিজচূর্ণ ও রাসায়নিক মিলিয়ে অঙ্গার যোগ করে আতশবাজি বানায় যা আজ ভারতীয় জীবনে সকল উৎসবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ আতশবাজি শব্দটি ফার্সি, আতশ (আগুন) ও বাজি (খেলা) দুটি শব্দের যোগে তৈরি। কালীপুজো ও তারপরবর্তী সব পূজোতেই যেভাবে কলকাতাবাসী আতশবাজির আনন্দের সঙ্গে কষ্টও ভোগ করেছে তা সকলেই জানে। আতশবাজি থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া ও প্রচণ্ড শব্দ করে নাগাড়ে ফেটে চলা বোমা ও পটকা আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছিল প্রায়। পুরো নভেম্বর মাসটি কলকাতা ছিল বায়ুদূষণে দেশে এক নম্বর স্থানে, দিল্লির অবস্থাও ছিল কলকাতা থেকে অনেক ভালো।

টানা প্রায় একমাস ধরে কলকাতাবাসী ভয়ঙ্করভাবে বিষাক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস নিতে বাধ্য হয়েছে। মানুষ সেই বিষাক্ত ধোঁয়া থেকে বাঁচবার জন্য জানলা-দরজা বন্ধ রেখে রক্ষা পাবার চেষ্টা করেছে। অনেকেই অর্থব্যয় করে বায়ুশোধক যন্ত্র কিনেছে। তবু সেই বিষাক্ত বায়ু ঘরে ঘরে কাশি, শ্বাসকষ্ট সৃষ্টি করেছে। যারা বাজি পুড়িয়েছে তারাও সমভাবেই এর কুফল ভোগ করেছে।

হরিয়াণায় শস্যের নাড়া পোড়ানো চলছে।

নভেম্বর মাসের প্রায় পুরোটাই বাতাসে অতিসূক্ষ্ম ২.৫ মাইক্রন আকারের কণার পরিমাণ কলকাতায় প্রতি ঘনমিটার বায়ুতে ছিল ৩০০—৪০০ পিপিএম। এই অতিসূক্ষ্ম রাসায়নিক, ধাতুকণা ও ধূলিকণা শ্বাসবাহিত হয়ে আবাল-বৃদ্ধবনিতার শ্বাসযন্ত্র ও রক্তস্রোতে যে বিষ সঞ্চারিত করল তার কুফল অপরিমেয় ও অপূরণীয়। গবেষকরা বলছেন দীর্ঘকাল ধরে রক্তস্রোত বিষাক্ত হওয়ায় প্রধানত শিশু ও বৃদ্ধেরা শ্বাসকষ্টে ভুগবে, গর্ভবতী মহিলাদের অটিস্টিক ও নানাভাবে অসুস্থ শিশু জন্মাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। হার্ট ও মস্তিষ্কের রক্তবাহী নালীতে ক্যালশিয়াম জমে হৃদ্‌স্পন্দনের ছন্দপতন ঘটাবে ও আকস্মিক হৃদ্‌রোগে প্রাণ হারাবে কর্মব্যস্ত নারী ও পুরুষ। সমগ্র জনসমুদায়কে এমন অসহনীয় পরিবেশে রেখে দেওয়ার দায় কার এবং এর থেকে মুক্তির উপায়ই বা কী? কলকাতা বহু বছর ধরে ভারতের লাং ক্যান্সারের রাজধানী হয়ে আছে। এই উপাধি থেকে কলকাতাকে মুক্ত করার দায়িত্বই বা কে নেবে? কলকাতার প্রাক্তন মার্কিন কন্সাল জেনারেল ক্রেস হ্যাল কলকাতার দূষণ নিয়ে বলেছিলেন তাঁদের দেশ প্রদূষণ রোধে সফলতা পেয়েছে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করে ও তার সতর্ক পর্যবেক্ষণ সহ শক্তহাতে তার প্রয়োগ করে।

আজ থেকে প্রায় ২৭ মাস আগে জাতীয় হরিৎ বিচারালয় (NGT) রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে বায়ুর প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে বলে। এ যাবৎ রাজ্য সরকার সেগুলিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করায় রাজ্যের বড় শহরগুলি প্রদূষণের কবলে পড়ে ও এজন্য NGT রাজ্যকে পাঁচ কোটি টাকা জরিমানাসহ দিকনির্দেশ করেছে যাতে রাজ্যবাসী এই অসহনীয় পরিবেশ থেকে অবিলম্বে মুক্তি পায়। আজ থেকে ১০৩ বছর আগে ব্রিটিশ যুগে বাড়ির উনানের ধোঁয়া ও কারখানার চিমনির ধোঁয়া থেকে পরিবেশকে মুক্ত রাখতে ১৯০৫ সালে বেঙ্গল স্মোক নিউসান্স অ্যাক্ট তৈরি হয়েছিল যা অমান্য করলে ২০০০ টাকা জরিমানা ও এক মাসের জেল হতো। দ্বিতীয়বার তা করলে ৫০০০ টাকা জরিমানা ও দু'মাসের জেল ছিল শাস্তি। তখন মোটরযানের ধোঁয়ার উপদ্রব তেমন ছিল না বলে সে বিষয়ে আইন হয়নি। আজ ধোঁয়ায় আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন হলেও, মানুষ জীবন্মৃত হয়ে বাস করলেও তা থেকে উদ্ধারের উপায় নেই। কোনও আইন নেই, কারও কোনও শাস্তি দেই। দু'বছর আগে দিল্লির পরিবেশ ছিল এমনই অসহনীয়। তখন দিল্লি সরকার গাড়ির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে জোর-বিজোড় নম্বরের গাড়ির জন্য আলাদা দিন স্থির করে, নির্মাণ সংস্থাগুলিকে নিয়মে বেঁধে, বাজারে বাজি বিক্রি নিয়ন্ত্রিত করেও নানা উপায়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে। ছোট ছেলে মেয়েদের দূষণ থেকে রক্ষা করতে স্কুল বন্ধ রাখে অনেকদিন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভারত স্টেজ VI এমিশন স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে দিল্লি সরকার সেখানে ৪০ লক্ষেরও বেশি পুরাতন গাড়িকে বাতিল করেছে।

দিল্লির বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ পঞ্জাব ও হরিয়ানায় জমির নাড়া পোড়ানো ধোঁয়ার সমস্যা। গ্রিন রেভলিউশনের ফলে সেখানে কাস্তে দিয়ে গোড়া ধরে শস্য না কেটে হার্ভেস্টার যন্ত্র দিয়ে শস্যের শিষের অংশটুকু কাটা হয় মাত্র। হাজার হাজার হেক্টর জুড়ে পড়ে থাকা শস্যের নাড়া যাকে সেখানে পরলী বলা হয় সেগুলি পুড়িয়ে দিয়ে কৃষকেরা ক্ষেতকে মুক্ত করে। অগ্রহায়ণ মাসের শস্য কাটার পর রবিশস্যের চাষের আগে ক্ষেত তৈরি করতে এভাবে সৃষ্টি হয় বিপুল পরিমাণের ধোঁয়ার যা স্থানীয় বায়ুর প্রবাহ ধরে জমা হয় দিল্লি অঞ্চলে। সেই ধোঁয়া প্রতিবছর শীতের মুখে দিল্লিবাসীকে অসহনীয় কষ্টে ফেলে। এরও একটা সর্বজনগ্রাহ্য ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে সারা বিশ্বে ২০১৬ সালে ১১ লক্ষ লোক দূষণ সংক্রান্ত রোগে মারা গিয়েছিল। শরীর অসুস্থ হলে লোকে আহার-বিহার, পোশাক সহ সমগ্র দিনচর্যাকে নিয়ন্ত্রিত করে নিজেকে সুস্থ করে। প্রকৃতি অর্থাৎ মানুষের জীবনের আধার, তার স্বাভাবিকতা হারিয়েছে। তার নিজস্ব শোধন ব্যবস্থা অকার্যকরী হয়ে পড়েছে। মানুষকে এখন নিজের স্বার্থে প্রকৃতিকে প্রকৃতিস্থ হতে সহায়তা করতে হবে। এজন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা যেমন স্বাগত, তেমনই স্বাগত সমষ্টিগত প্রচেষ্টাও সামগ্রিকভাবে সকল দেশকে মিলিত করে বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টার। অপচয় রোধ, এর এক বড় অঙ্গ। ব্যক্তিগত ভাবে কোনও কিছুই অপচয় না করা, তা সে খাদ্য, বস্ত্র জল বা শক্তি যাই হোক না কেন—এক ফলপ্রসু পদক্ষেপ। সমষ্টিগত ভাবে বায়ুকে প্রদূষণমুক্ত রাখতে অন্যান্য বহু পদক্ষেপের সঙ্গে বিগত কয়েক বছর ধরে ইউরোপের বহু শহর বড়দিন ও নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়েছে আতশবাজি না করে। আমাদের প্রতিবেশী সিঙ্গাপুর ১৯৭২ সাল থেকেই সেখানে আতশবাজি নিষিদ্ধ করে রেখেছে। ২০১৮ সালের দেওয়ালিতে সেই নিষেধ অমান্য করায় ছয়জন ভারতীয় যে সেখানে দণ্ডিত হয়েছেন সে খবরও আমরা পেয়েছি। বিশ্বস্তরেও এই প্রচেষ্টা চলেছে সেই ১৯৭২ সাল থেকে যাতে বিশ্ব উষ্ণায়ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। এরই নানা পদক্ষেপের মধ্যে একটি হল বৃক্ষরোপণ। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বৃক্ষরোপণ দেখেছি অযোধ্যা পাহাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। প্রতিষ্ঠানগত বৃক্ষরোপণের নানা খবর থাকে নানা সময়ে সংবাদপত্রে। সদ্য প্রকাশিত এক খবরে দেখলাম দুটি প্রতিষ্ঠান (যুগ্মভাবে) ইন্দোরে দেড়লক্ষ, চেন্নাইয়ে দেড়লক্ষ, দিল্লির রাজধানী অঞ্চলে সত্তর হাজার ও আহমেদাবাদে একলক্ষ তিরিশ হাজার বৃক্ষ রোপণ করেছে এই বর্ষার পর। শুধু দুঃখ পেয়েছি পশ্চিমবঙ্গের কোনও অঞ্চলে এমন শুভকাজ হওয়ার খবর না থাকায়। তবু আশা হয় হয়তো সামনের বছর দেবীপক্ষ এমন ধূম্রময় হবে না, বায়ু সর্বত্র নির্মল হবে, বসুন্ধরার তাপ কমবে ও বর্ষাকালে বৃষ্টি দেবে। দূষিত বায়ু সেবন করে মানুষ মৃত্যুপথে এগিয়ে যাবে না। ▮

শাহ, গুর্জর, গুজরাট শব্দগুলি ভারতীয়

সম্প্রতি মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব বিশিষ্ট বিজেপি নেতা অমিত শাহকে কটাক্ষ করে বলেছেন, শাহ পদবি 'শাহ' এবং 'গুর্জর', 'গুজরাট' নামগুলি পারসি ভাষা থেকে এসেছে। হাবিব সাহেবের মন্তব্য সঠিক নয়। বিষয়টি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

শাহ : প্রাচীন যুগে ন্যায়পরায়ণতার জন্য বণিক সম্প্রদায়কে শ্রেষ্ঠী বলা হতো। শ্রেষ্ঠী শব্দের অনুকরণে শেঠ শব্দ এসেছে। আবার সততার জন্য শ্রেষ্ঠীকে সাধুও বলা হতো। এই সাধু শব্দ উচ্চারণ ভেদে সাউ বা সাহু হয়ে যায়। বঙ্গদেশে সাহু কথাটি শাহ বা সাহা এবং উত্তর ও পশ্চিম ভারতে শাহ বা শা হয়ে যায়। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পারসি ভাষার 'শাহ' শব্দের অর্থ বাদশাহ বা সম্রাট হলেও ভারতীয় 'শাহ' শব্দের মূলে রয়েছে সংস্কৃত 'সাধু' শব্দটি।

গুর্জর-গুজরাট : ইতিহাস অনুযায়ী প্রাচীন যুগে পঞ্চম শতাব্দীতে বৈদেশিক এক জাতি পঞ্জাব হয়ে রাজস্থানে প্রবেশ করে। উল্লেখ্য, এই অবস্থায় শব্দগুলি পারস্য দেশ থেকে আসার প্রশ্ন আসে না। যাই হোক, সংস্কৃত অভিধান অনুযায়ী 'গুর্' শব্দের অর্থ গমন করা আর 'জর' বা 'জরা' শব্দের অর্থ জীর্ণ শীর্ণ মলিন হওয়া। সুতরাং গুরজর বা গুর্জর শব্দের অর্থ দাঁড়ায় জীর্ণ বা জর অবস্থায় যারা গমনাগমন করতেন। প্রথম অবস্থায় নবাগত বৈদেশিকরা যাযাবর বা ভবঘুরে জীবন যাপন করতেই পারেন।

কালক্রমে এদের একাংশ ক্ষত্রিয় রাজপুতদের সংস্পর্শে আসেন। ক্ষাত্র আচরণ গ্রহণ করে যোদ্ধাজাতিতে পরিণত হন। 'গুর্জর-প্রতিহার' কথার মধ্যে গুর্জর-রাজপুত রক্তসংমিশ্রণের কথা লুকিয়ে আছে। গুর্জররা একসময় রাজস্থানের যোধপুর অঞ্চলের অধিপতি হন। কালক্রমে যোধপুরের দক্ষিণে বিস্তার লাভ করেন। দক্ষিণে বিস্তারিত ভূখণ্ড হচ্ছে বর্তমান গুজরাত রাজ্যের পূর্ব অংশ। প্রথমে এই অংশের নাম গুর্জর জাতিনাম থেকে গুজরাট হয়। বলা বাহুল্য, পরবর্তীতে সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উল্লেখ্য, গুর্জরদের অন্য অংশ গবাদি পশু পালন করতেন। তার জের হিসেবে দুগ্ধ উৎপাদনে গুজরাট ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। গো পালনের জন্য তারা গোপালক শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ বৈষ্ণবপন্থী হওয়ার জন্য মার্গ গুজরাট প্রায় শাকাহারি বা নিরামিষভোজী রাজ্য।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

কারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল

কারা নোটবাতিলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল? যাদের দু'নম্বরি টাকা ছিল তারাই নয় কি? একটা ঘটনা বলি। ৫০০ টাকার নোট বাতিল ঘোষণা হয়েছে। একদিন আমি আমার উকিলবাবুর ঘরে বিকেলে বসে আছি। ইনকাম ট্যাক্সের রিটার্ন জমা দেবার হিসাব করতে জনৈক ভদ্রলোক উপস্থিত হলেন সেখানে। উকিলবাবুর সঙ্গে তার কথাবার্তা শুরু হলো। বললেন তার অনেক নগদ টাকা অর্থাৎ দুনম্বরি নোট (৫০০ টাকার) আছে। এখন কী করবেন সেই পরামর্শ চাইছেন।

উকিলবাবু আমার কাজ শেষ করে আমাকে বিদায় করে দিলেন। ওই ভদ্রলোকের বিপদে কী পরামর্শ উকিলবাবু দিয়েছিলেন তা আমি জানি না।

এই ঘটনা থেকে বুঝুন নোট বাতিলে কাদের অসুবিধা হয়েছে। আমাদের ধারণা নোট বাতিলে তারাই চেঁচামেচি করছেন, যাদের দুনম্বরি টাকা ছিল। 'এই কথাটি মনে রেখো'—রবীন্দ্রনাথের গানের এই লাইনটি লিখে শেষ করছি। সমান্তরাল দুনম্বরি অর্থব্যবস্থা দেশের পক্ষে কাম্য কি?

—**ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার,**
২০বি, দমদম পার্ক, কলকাতা-৩৫।

চিঠিপত্র

ভারতে আসা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশ ফেরত নেবে তো?

উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের ফেরদৌসি খাতুন যে ভাবে তাঁর লেখনী তুলে ধরেছেন, তাতে তাকে বাংলাদেশের খ্যাতনামা লেখিকা তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে তুলনা করলে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। ফেরদৌসি খাতুন যেভাবে পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন সে হিসাব হয়তো বাংলাদেশ থেকে এসে বসবাসকারী অনেক হিন্দুই করতে পারবে না। ভারতীয় জাতীয়তাবোধের ওপর এমন শ্রদ্ধা সবার যদি থাকত তবে হয়তো সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি হতো না। উনি লিখেছেন টেকনাথ থেকে তেথুলিয়া পর্যন্ত যে ভাবে মুসলমান রাজাকার বাহিনী হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। এমন একজন দরদি লেখিকার সবারই শ্রদ্ধা পাওয়া উচিত। ওঁর লেখাতে একথাই প্রমাণ হয়, এখনো কিছু মানুষের সত্য ভাষণের ক্ষমতা অটুট আছে। ওঁর কথায় ভারত থেকে কোনও হিন্দু বাংলাদেশে গিয়ে থাকার সাহস রাখে না। একথা সর্বৈব সত্য। এবার ওনার আরেকটি কথার দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক। সেটা হলো ভারতের স্থানীয় মুসলমানরা কখনওই আগ বাড়িয়ে বাংলাদেশে গিয়ে রিফিউজি সেজে ওখানকার স্থানীয় মুসলমানদের মুখ ঝামটা খাবে না। যেটা উনি প্রকারান্তরে তুলে ধরেননি সেটা আমি উল্লেখ করলাম। এন আর সি-র ব্যাপারে ফেরদৌসি খাতুন

আরকটি দামি কথা বলেছেন। সেটা হলো বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের যদি দেশে ফেরানোর ব্যাপারে ভারত চাপ দেয়, সেটা কি ওদের মতো দেশের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হবে?

—**স্বপন কুমার ভৌমিক,**
শান্তিপুর।

ঔপনিবেশিক নাম বদলে বিরোধিতা কেন?

ভারতবর্ষ ছিল প্রায় হাজার বছর পরাধীন। শক, হুন, পাঠান, মোগল, গ্রিক, পর্তুগিজ, ইংরেজ ইত্যাদি আক্রমণকারীদের দ্বারা ভারত বারবার হয়েছে আক্রান্ত। অত্যাচারিত, শোষিত ও অপমানিত হয়েছে ভারতবাসী। অসংখ্য মঠ, মন্দির তথা ধর্মস্থান ও শ্রদ্ধাবিন্দু হয়েছে আক্রান্ত, অপবিত্র ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত। বহু স্থান ও স্মৃতি সৌধের নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয়েছে নিজেদের মর্জিমাফিক নামে। আর এটাই হচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর চিরাচরিত রীতি, নীতি ও সংস্কৃতি। এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক মুসলমান ও খ্রিস্টান শাসকরা একই পথের পথিক।

তবে শক, হুন, গ্রিক, মোঙ্গল প্রভৃতি আক্রমণকারীরা ভারত আক্রমণ করলেও তারা এদেশে স্থায়ী আস্তানা গাড়েনি। লুটপাট, নির্যাতন ও হত্যালীলা সংগঠিত করে এবং ধর্মস্থান অপবিত্র বা ধ্বংস করে ফিরে গিয়েছে নিজ নিজ দেশে। কিন্তু মুসলমান আক্রমণকারীদের একাংশ লুণ্ঠন, নির্যাতন, নিধন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে দেশে ফিরে গেলেও বাকিরা বিশেষত পাঠান, মোগল এবং পর্তুগিজ, ইংরেজ আক্রমণকারী ঔপনিবেশিকরা এদেশেই ঘাঁটি গেড়ে ছিল দীর্ঘদিন। আর এই দীর্ঘ সময়ে তারা এদেশের মানুষের উপরে যেমন চালিয়েছে অবর্ণনীয় উৎপীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনা তেমনি চালিয়েছে নরহত্যা, ধর্মান্তরকরণ, নারীধর্ষণ, শাসন ও ধ্বংসলীলা। অগণিত হিন্দু মন্দির ধূলিসাৎ করে সেখানেই নির্মাণ করেছে মসজিদ বা গির্জা। অধিকাংশ মুসলমান শাসক ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের ইট-পাথর দিয়ে নির্মাণ করেছে বহু মসজিদ বা স্মৃতিসৌধ। যেমন, অযোধ্যার রামমন্দির ভেঙে বাবর নির্মাণ করেছিল বাবরি সৌধ, যাকে বলা হচ্ছে 'বাবরি মসজিদ'। অনুরূপভাবে, আওরঙ্গজেব কাশী বিশ্বনাথ শিব মন্দির ভেঙে নির্মাণ করেছে জ্ঞানবাপী মসজিদ এবং মথুরার কৃষ্ণমন্দির ভেঙে নির্মিত হয়েছে মসজিদ।

এভাবে হাজার হাজার মন্দির ভেঙে ভারতে নির্মিত মসজিদ। আগ্রার 'তেজো মহল'-এর উপরে শাজাহান নির্মাণ করেছে 'তাজমহল'— সেটি একটি মন্দিরও বটে। দিল্লির আর একটি মন্দির ভেঙে নির্মিত হয়েছে 'কুতুব মিনার'। প্রতিষ্ঠাতা দিল্লির তৎকালীন শাসক কুতুবুদ্দিন আইবক। এছাড়াও মুসলমান শাসকরা নিজেদের নামে বিভিন্ন স্থান ও রাস্তার নামকরণ করেছে। যেমন, ফৈজাবাদ (অযোধ্যা), এলাহাবাদ (প্রয়াগ), আহমদাবাদ (কর্ণাবতী) ছাড়াও হায়দরাবাদ, আওরঙ্গাবাদ, নিজামাবাদ, আলিগড়, মোরাদাবাদ, বক্তিয়ারপুর, আকবরপুর, শাজাহানপুর, সুলতানপুর, আদিলাবাদ, রহমতগঞ্জ, সেকেন্দ্রাবাদ, বহরমপুর (ব্রহ্মপুর), মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি। পির, দরবেশ, আউলিয়াদের নামেও বহুস্থানের নামকরণ হয়েছে। আবার পর্তুগিজ ও ইংরেজ শাসকরাও বহু স্থান ও রাস্তার নাম পাল্টে নিজেদের মতো নামকরণ করেছে। যেমন, বোম্বে, মাদ্রাজ, ত্রিবান্দ্রাম, ক্যালকাটা, ব্যাঙ্গালোর, পোর্ট-ব্লেয়ার, ইডেন গার্ডেন্স, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঔপনিবেশিক শাসকরা আজ আর এদেশে নেই। ভারত স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। তাহলে তাদের দেওয়া নাম আজও এদেশে রক্ষিত হবে কেন? বিশ্বে এমন কোনও দেশ আছে কি যে দেশে ঔপনিবেশিক শাসকদের দেওয়া নাম আজও রয়েছে? বহু স্থান ও রাস্তার নাম পাল্টেছে। কিন্তু মুসলমান নামগুলি অপরিবর্তিত রয়েছে। কেন? মুসলমান শাসকরা কী বহিরাগত ছিল না? এক যাত্রায় কেন পৃথক ফল? মাদ্রাজ যদি চেন্নাই, বোম্বে যদি মুম্বই, ডালহৌসি স্কোয়ার যদি বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ বা মনুমেন্টের নাম শহিদ মিনার হতে পারে তবে দিল্লির নাম ইন্দ্রপ্রস্থ, এলাহাবাদের নাম প্রয়াগ, আহমদাবাদের নাম কর্ণবতী বা বহরমপুরের নাম ব্রহ্মপুর হবে না কেন? বাংলাদেশে ঢাকার জিন্না অ্যাভেনিউ যদি বঙ্গবন্ধু অ্যাভেনিউ হতে পারে, তা ভারতে ভাবতে বাধা কেন? আজ যখন দেশপ্রেমিক ও জাতীয়বাদী সংগঠনগুলি ঔপনিবেশিক নাম বদলের দাবি তুলছে এবং পূর্ব নামে ফিরিয়ে আনতে চাইছে, তখন বাম-সেকুলারবাদীরা গেল গেল রব তুলছেন। কেন? কারণ দেশপ্রেম নয়, তাঁদের কাছে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক মূল্যবান। আসলে এমনটাই হয়। যারা ভোগী, ক্ষমতা লোভী--- যাদের কাছে স্বধর্মী, স্বদেশের থেকে বিধর্মী, বিদেশ শ্রেয়, তারা দেশদ্রোহির শামিল। আর তাই তো ভারত আক্রমণকারী আলেকজান্ডার বলেছিলেন— সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ।

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

পারিবারিক হিংসায় মহিলাদের আইনি সুরক্ষা

সৌমী দাঁ

পারিবারিক হিংসার শিকার নির্যাতিত মহিলাদের সুবিধা ও সুবিচার পেতে সাহায্য করা এবং ওই সংক্রান্ত আইনটি সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া সব শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের দায়িত্ব।

এই আইনে একটি পরিষেবা প্রদানকারী (সার্ভিস প্রোভাইডার) সংস্থা রয়েছে। পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে সংস্থা রেজিস্ট্রেশন আইন (সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট) অনুযায়ী স্বীকৃত হতে হবে। কোনও সংগঠন কোম্পানিজ অ্যাক্টে স্বীকৃত হলেও পরিষেবা দিতে পারে।

পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা (সার্ভিস প্রোভাইডার)-গুলির ভূমিকা :

পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি যে ভাবে কাজ করে—

(১) নির্যাতিতা মহিলাদের আইনানুগ বা কোর্টের অর্ডার অনুযায়ী আইনানুগ পদ্ধতিতে সুরক্ষা দেওয়া ও তাদের অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষা করা। মহিলাদের আইনি সাহায্য, ডাক্তারি সাহায্য, আশ্রয় ইতাদির ব্যবস্থা করা।

(২) পারিবারিক নির্যাতন রিপোর্ট তৈরি করে সেই রিপোর্টের কপি ম্যাজিস্ট্রেট এবং সুরক্ষা অফিসারের কাছে পাঠানো।

(৩) প্রয়োজনে নির্যাতিত মহিলার ডাক্তারি পরীক্ষা করানো। এবং সেই মেডিক্যাল রিপোর্টটির স্থানীয় একটি কপি এলাকাধীন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ও আরেকটি কপি এলাকাধীন থানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

(৪) যদি বাসস্থানের অসুবিধা থাকে তাহলে নির্যাতিতা মহিলার আশ্রয়স্থল বা আবাসের ব্যবস্থা করা। এবং নির্যাতিতা মহিলাটি যে আশ্রয়ের অভাবে যেখানে আশ্রয় নিয়েছেন সেই ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো এবং সেই মহিলাটি যে পারিবারিক হিংসার শিকার তাও থানায় জানানো।

এই আইনে শেয়ার্ড হাউসহোল্ড বলতে কী বোঝায়?

যে বাড়িতে নির্যাতিতা মহিলা বাস করেন, নির্যাতনকারীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকাকালীন কোনও সময়ে একা বাস করেছেন, মালিক কিংবা ভাড়াটে হিসাবে যৌথ বা এককভাবে নির্যাতনকারীর সঙ্গে বসবাস করেন। অথবা যে বাড়ি যৌথ পরিবারের মালিকালাধীন এবং নির্যাতনকারী সেই যৌথ পরিবারের সদস্য।

এই আইনে বসবাসের নির্দেশ (রেসিডেন্স অর্ডার) বলতে কী বোঝায়?

এই আইনে এটি একটি বৈশিষ্ট বা সুবিধা বা সুরাহা যা নির্যাতিতা মহিলা পেতে পারেন। যে সব মহিলা নির্যাতিতা অথচ নানা সামাজিক চাপে ও ভয়ে মুখ খুলতে পারেন না বা অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে বাধ্য হন তাঁদের জন্য এটা একটা বিশেষ সুবিধা। নির্যাতিতারা মুখ বুজে সহ্য করেন, কারণ হয়তো প্রতিবাদ করলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে বা সন্তানরা ওপরে অত্যাচার করা হবে, তার এই বসবাসের নির্দেশের মাধ্যমে (রেসিডেন্স অর্ডার) সুরাহা পাবেন। এই আইনে স্পষ্ট করে বলা আছে যে, নির্যাতিতা মহিলা যেখানেই থাকুন, সেই সম্পত্তিতে তাঁর মালিকানা থাকুক বা না থাকুক জোর করে তাকে রাস্তায় বার করে দেওয়া যাবে না। বরং ক্ষেত্রবিশেষে আদালত নির্যাতনকারীকে অন্য কোথাও সরে যাবার বিশেষ আদেশ দিতে পারেন। নির্যাতনকারী বাড়িটি বিক্রি বা হস্তান্তর যাতে না করতে পারে তার আদেশ দেওয়া হবে। প্রয়োজনে ম্যাজিস্ট্রের পরিস্থিতি বিচার করে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা ও বাড়ি ভাড়া করে দেওয়ার ব্যবস্থা নির্যাতনকারীকেই করার নির্দেশ দেবেন।

এই আইনে ক্ষতিপূরণের আদেশ (কম্পেনসেশন অর্ডার) :

পারিবারিক হিংসার কারণে কোনও মহিলার শারীরিক ক্ষতি হলে, তাঁর কোনও মানসিক আঘাত লাগলে বা আবেগজনিত কারণে ক্ষতি হলে ম্যাজিস্ট্রেট নির্যাতনকারীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন। পরিস্থিতি বিচারের পর অন্যান্য বিষয়ে আদেশের ওপর অতিরিক্ত ভাবেও ম্যাজিস্ট্রেট এই আদেশ দিতে পারেন।

আবেদনের ব্যবস্থা :

এই আইনে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে অভিযোগকারী মহিলা বা নির্যাতনকারী উচ্চ-আদালতে আবেদন করতে পারেন।

এই আইনে অন্তবর্তী আদেশ ও একতরফা আদেশ : পরিস্থিতি বিচারে যদি ম্যাজিস্ট্রেট দেখেন নির্যাতিতা মহিলার ওপর কোনও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে বা নির্যাতনকারী কোনও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়েছে বা এমন আশঙ্কা রয়েছে। তবে সেই নির্যাতিতা মহিলার হলফনামার ওপর ভিত্তি করে অন্তবর্তী আদেশ দিতে পারেন। এই আইনে ম্যাজিস্ট্রেট পরিস্থিতি বিচারে একতরফা আদেশও দিতে পারেন।

এই আইনে অপরাধীর শাস্তি :

এই আইন শাস্তিমূলক নয়। নির্যাতিতা মহিলার যেসব অধিকার খর্ব করা হয়েছে সেই অধিকারগুলি ফিরিয়ে দেওয়া এবং তার নিয়মিত সুরক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয় এই আইনে। এটি একটি দেওয়ানি আইন। যদি নির্যাতনকারী ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া সুরক্ষা অর্ডার না মানে তবে এই আইনে তাকে অপরাধী গণ্য করে ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য হবে। সেই অপরাধ জামিন অযোগ্য হবে এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে। ম্যাজিস্ট্রের জারি করা সুরক্ষা নির্দেশ অগ্রাহ্য করলে সেই ফৌজদারি অপরাধের জন্য এক বছর কারাবাস ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে।

শীতে ত্বকের সমস্যায় হোমিওপ্যাথি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

শীত আসন্ন প্রায়। আর শীতকাল মানেই বাতাসের আর্দ্রতার পরিমাণ কমে গিয়ে শুষ্কভাব, যার জেরে চামড়াও শুষ্ক হয়ে যায়। হাতের চামড়া রুক্ষ্ম হয়ে যাওয়া, ক্রমাগত ঠোঁট ফাটা, পা ফাটার সমস্যায় এসময়ে জেরবার হয় অনেকেই। এছাড়া পায়ে ডেডসেল, ক্যারোটিনয়েড সেল, চামড়া মাছের আঁশের মতো হয়ে যাওয়ার নানা সমস্যা তো আছেই। অতিরিক্ত শুষ্কতা থেকে হতে পারে চুলকানি। এই সমস্যা থেকে কীভাবে মিলবে সমাধান, বলে আজকের পাতায় রইল তারই হদিশ।

১। **চামড়া উঠে যাওয়া :** শীতকালে মানুষের চামড়ার পরিবর্তন খুব বেশি করে দেখা যায়। বিশেষ করে হাতের তালুতে শুষ্কভাব, বলিরেখা পড়া, আর পায়ের পাতার চামড়া ফেটে, কখনও কখনও তা মাছের আঁশের আকার নেওয়া। অনেক সময় তো পায়ের মরাকোষ বেড়ে গিয়ে এমন অবস্থা হয় যে চলতে-ফিরতে রীতিমতো অসুবিধা হয়। অনেকে টেনে টেনে সেই কোষ তোলার চেষ্টা করেন, কিন্তু এভাবে চামড়া তোলা বা বাড়িতে রেজার দিয়ে কেটে রক্তপাত হলে তা থেকে পরে একজিমা, ইনফ্লামেশনের সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে হেক্সাসল লাগিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ত্বক বিশেষজ্ঞকে দেখানো উচিত। রক্তপাত বন্ধ না হলে চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক মলম লাগাতে হবে। যাদের পায়ের তলার চামড়া ক্যারোটিনডেস হয়ে মোটা হয়ে যায়, তাঁদের স্যালিসাইসিক এসএফ সিক্স যুক্ত অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করা প্রয়োজন। এবং নিয়মিত পেডিকিওর করানো প্রয়োজন।

২। **পায়ের তলা ও ঠোঁট ফাটা :** এই দুই সমস্যায় শীতকালে জেরবার হননি, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার।

ঠোঁটে দুধের সর লাগিয়ে খানিকক্ষণ পর ধুয়ে নিলে তার সঙ্গে মরা চামড়া উঠে আসবে। খানিকক্ষণ পর পর পেট্রোলিয়াম জেলি, লিপবাম লাগালে সমস্যাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ জলপান আবশ্যক, যাতে শরীর ভিতর থেকে হাইড্রেটেড থাকে। পায়ে স্নানের সময় নিয়মিত পিউমিক স্টোন দিয়ে ঘষে পেট্রোলিয়াম জেলি জাতীয় লোশন লাগাতে হবে দিনে তিন-চার বার। রাত্রে লোশন লাগিয়ে মোজা পরে শুলে পা ফাটা অনেকটা কমে আসবে।

৩। **হাত ও পা ঘেমে যাওয়া :** এটা শীতের একটা বিরক্তিকর সমস্যা। আর সারাদিন জুতো-মোজা পরে থাকতে থাকতে পা ঘেমে সেখান থেকেও একটা দুর্গন্ধ বেরোয়। এর সমাধানে বাড়ি ফিরে এক গামলা উষ্ণ গরম জলে কয়েকটি পটাশ দানা ফেলে দিন। জলের রং হালকা বেগুনি ধরলে তাতে ১০-১৫ মিনিট পা ভিজিয়ে রাখুন। হাতও ডোবাতে পারেন।

৪। **স্কেবিস :** স্কেবিস বা খোসপাঁচড়া রোগটির সঙ্গে শীতকালে আমরা সকলেই পরিচিত। ছোঁয়াচে এই রোগটির কারণ পরজীবী আক্রমণ। এই রোগে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা খুবই জরুরি। গরম জলে স্নান করার পর নির্দিষ্ট মলম লাগাতে হবে ও দু-একদিন ছাড়া ছাড়া রোগীর জামা-কাপড়, বিছানা ইত্যাদিও গরম জলে অ্যান্টিসেপটিক লোশন ফেলে ধোওয়া উচিত।

খুশকি : শীতকালে আরও একটা যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার হলো খুশকি। মাথায় মরাকোষে ময়লা জমে তৈরি হয় খুশকি। এসময় ভালো করে চুল না ধুলেই এই ময়লাগুলো ক্রমশ জমতে থাকে, ফলে মাথার চুলে সাদা সাদা খুশকি দেখা যায়। এছাড়াও খুশকি বেশি বেড়ে গেলে, কপালে র‍্যাশ বের হয়। নিয়মিত দুদিনের ব্যবধানে অ্যান্টি ড্রানড্রফ শ্যাম্পু ব্যবহার করা উচিত। সঙ্গে মাথায় অবশ্যই তেল দেবেন। কেননা শুষ্ক ত্বকে খুশকি আরও বেশি বাড়ে। র‍্যাশে ক্লোট্রিমাজোল জাতীয় লোশন লাগালে উপকার মিলবে।

সানবার্ন : শীতকালে রোদের তেজ এমনিতেই বেশি থাকে। তাই রোদে বেরনোর সময় অতি অবশ্যই সানস্ক্রিম মেখে বেরনো উচিত। বাইরে বেরনোর অন্তত মিনিট পনেরো আগে এসপিএফ ৪০ বা ৫০ যুক্ত সানস্ক্রিম মেখে বেরোলে সানবার্নের সম্ভাবনা থাকে না। সঙ্গেও সানস্ক্রিম ক্যারি করুন। দুপুরের দিকে আরও একবার মেখে নেবেন।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা : কারণ, লক্ষণ ও মায়জম মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে শীতের ত্বকের সমস্যার সহজে সমাধান হয়ে যায়। এটা আমি আমার ৩৫ বছরের চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি। ■

হিন্দুর দেবতা ভাঙিয়ে এবার ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা

বিজয় আঢ্য

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের প্রসঙ্গটি আবার চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। সম্প্রতি দেশের শীর্ষ আদালত রামমন্দির সংক্রান্ত মামলার শুনানি আরও পিছিয়ে দেওয়ায় দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। প্রায় সব রাজনৈতিক দলই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ঘোলাজলে মাছ ধরতে চাইছে। এ ব্যাপারে সব থেকে এগিয়ে আছেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। রাজনীতিতে ক্ষমতায় টিকে থাকতে তিনি এবার বিভাজনের রাজনীতির পথ ধরেছেন। এতদিন তুষ্টিকরণের রাজনীতি করে এসেছেন, এবার সেইসঙ্গে বিভাজনের। আর তা করতে গিয়ে তিনি এবার হিন্দুদের দেবলোকে হানা দিয়েছেন। ঘটনা হলো গত ২৬ নভেম্বর ঝাড়গ্রামের কাপবাড়িতে প্রশাসনিক সভার মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, 'আমরা দেবতা বিক্রি করে খাই না'। কিছুদিন আগেই কটাক্ষ করে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—'তোমরা যে রামের পুজো কর, সেই রাম দুর্গাপূজা করেছিলেন। কিন্তু দুর্গাপূজার সময় তোমাদের নেতাদের বাংলার মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটা ব্যানার ফেস্টুনও দেখা গেল না'। এই একই বিষয় নিয়েই তৃণমূল সুপ্রিমোর বক্তব্য—'তোমাদের রাম থাকলে আমাদের দুর্গা আছেন। রামচন্দ্রও তো মা দুর্গার পূজা করেছিলেন, আসলে ওরা (বিজেপি) রাবণের পুজো করে। ওরা দেবতাকে বিক্রি করে খায়।'

নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে এবার হিন্দুদের দেবতা নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা বলেননি। মূল (বাল্মীকি) রামায়ণে রাবণবধের সময় দুর্গাপূজার কোনও কথা না থাকলেও, অন্যান্য পুরাণে, বিশেষত কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণে আছে। সেখানে শ্রীরামচন্দ্র দেবী দুর্গার স্তুতি করেছেন—

"নমস্তে সর্বাণী
ঈশানী ইন্দ্রাণী
ঈশ্বরী ঈশ্বরজায়া।........"

সংকল্প রক্ষার জন্য 'কমললোচন' শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বলেছেন—

"এত বলি তূণ হৈতে লইলেন বাণ।
উপাড়িতে যান চক্ষু করিতে প্রদান।।"

কিন্তু এই দুই রামায়ণে রাবণপূজার

> উপসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে হিন্দুসমাজকে বিভক্ত করার চেষ্টা রাষ্ট্রদ্রোহিতার নামান্তর। মা দুর্গাকে ভাঙিয়ে ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করার মতো অপচেষ্টা হিন্দু সমাজ ঘৃণার সঙ্গেই বারবার প্রত্যাখান করেছে, এবারও করবে।

কথা কোথাও নেই। নিজের পক্ষে পুরাণকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে তিনি অর্ধসত্যের আশ্রয় নিয়েছেন। অর্ধসত্য মিথ্যার থেকেও ভয়ংকর।

বস্তুত ভারতীয় জাতিসত্তায় রাবণপূজার স্থান নেই। থাকা সম্ভবও নয়। যেসব মূল্যবোধের উপর ভারতবর্ষ দাঁড়িয়ে আছে, এক কথায় যাকে 'ধর্ম' বলে তার অন্যতম অঙ্গ—'মাতৃবৎ পরদারেষু'। রাবণ এই মূল্যবোধের উপরই প্রচণ্ড আঘাত করেছিলেন। রাম অধার্মিক রাবণকে বধ করে ধর্মকে সংরক্ষণ করেছিলেন। তাই রাম ভারতীয় জাতিসত্তার প্রতীক। অযোধ্যার রামজন্মভূমিতে রামমন্দির তাই একটা মন্দির নির্মাণ মাত্র নয়, তা জাতীয় স্মারক। হাজার হাজার বছর ধরে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে যে জীবনধারা বহমান, তারই এক প্রতীকী প্রকাশ। বিদেশি মুঘল বাদশা বাবরের আক্রমণের চিহ্ন হিসাবে নির্মিত বাবরি কাঠামো তাই জাতীয় কলঙ্ক। কোনও স্বাভিমানী জাতিই নিজের কলঙ্ক-চিহ্ন বহন করে না। স্বাধীন হওয়া মাত্রই পোল্যান্ড তাই রাশিয়ার কমিউনিস্টদের তৈরি গির্জা ভেঙে দিয়েছিল। দেশে দেশে একম অনেক উদাহরণ মিলবে। তাই অসহিষ্ণুতার নামাবলী গায়ে চাপিয়ে এত বিরোধিতা ভণ্ডামি, মিথ্যাচার। মনে রাখতে হবে, ধৈর্যেরও একটা সীমা থাকে।

> **রাজনীতির জন্য, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জাতিসত্তাকে, রাষ্ট্রীয় অস্মিতাকে খুন করতেও দ্বিধা করব না? আমরা কি আবার ৪৬-৪৭-এর পুনরাবৃত্তি চাইছি?**

গত চারশো বছর ধরে জাতীয় অস্মিতা রক্ষার জন্য এদেশের হাজার হাজার মানুষ একের পর এক সংগ্রাম করে চলেছে, আত্মবলি দিয়েছে। এরপরও গত পাঁচ দশক ধরে এদেশের বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা রেখে এসেছে। সাম্প্রতিক শীর্ষ আদালতের একটা রায়ে সেই আস্থার উপর চিড় দেখা দিয়েছে। কোনও রাজনীতিক মহলের স্বার্থে দেশের বিচার ব্যবস্থা রামমন্দির প্রসঙ্গটি জিইয়ে রাখতে চাইছেন— এরকম একটা আশঙ্কা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কংগ্রেসের কপিল সিব্বাল শীর্ষ আদালতকে লোকসভা নির্বাচনের পর রায় দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

তাহলে কী এমন ঘটল যে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রামমন্দির নির্মাণকারীদের রাবণের পূজারি হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছেন? তিনি কি এবার হিন্দুদের মধ্যে বিভেদের বীজ বুনতে চাইছেন? হিন্দু বাঙ্গালিদের মধ্যে লড়াই লাগাতে চাইছেন। দুর্গাপূজা শুধুই আমাদের (হিন্দু বাঙালির)? আর বলছেন, আমাদের দুর্গা আছেন। বাকি ভারতের দুর্গাপূজা নেই? দেবীপক্ষের নয়দিন নবরাত্রি ব্রত হিসাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে পালিত হয়। এই নয়টি দিন বেশিরভাগ মানুষই উপবাস পালন করে আপন আপন চিত্তশুদ্ধি'র জন্য ব্রতী থাকেন। উপবাস ভঙ্গেও কোনও দেখনদারি নেই। অন্যদিকে যত দিন যাচ্ছে, এই রাজ্যে দুর্গাপূজা শারদীয়া উৎসবের রূপ নিচ্ছে। পূজার মাঙ্গলিক দিকটি কেমন যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। দুর্গাপূজার বদলে থিমপূজা হচ্ছে, খুঁটি পূজা হচ্ছে। বিশেষ করে শহর আর শহরতলীর পূজার ক্ষেত্রে। বিসর্জনের রীতিনীতিকে রাজ্যের প্রশাসনের নির্দেশে বদলে নিতে হচ্ছে। দেবীপক্ষের আগেই মণ্ডপে মণ্ডপে দেবীদুর্গার আবাহন হয়ে যাচ্ছে। এখন পূজাকে নিয়ে কমপিটিশন কার্নিভালের উন্মাদনা। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে বহু উপাসক, বহু সম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করছে। অক্ষয় দত্তের 'ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে তার বিস্তৃত বিবরণও আছে। কেউ কখনও 'তোমাদের রাম থাকলে আমাদের দুর্গা আছে' বলে বিভাজনের সৃষ্টি করেনি। উপাসনা পদ্ধতির বিভিন্নতা থাকলেও ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজ জাতীয় অস্মিতা রক্ষায় বরাবরই সচেষ্ট থেকেছে, এমনকী প্রয়োজনে কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করেও। এই যে বিজিগীষু মানসিকতা— বিপরীত পরিস্থিতিতেও নিজেদের লক্ষ্যে অটুট থাকা, জাতীয় অস্মিতাকে কোনও ভাবেই ধ্বংস না হতে দেওয়া-- এটাই ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। গ্রিস, মিশর, রোমে যা ঘটেছে হিন্দুসমাজ তা করতে দেয়নি। মুঘল- পাঠানদের বারোশো বছরের অত্যাচার সত্ত্বেও হিন্দুসমাজ ধ্বংস হয়নি। সোমনাথ মন্দির বিদেশি আক্রমণকারীরা বারবার লুণ্ঠন করেছে, কিন্তু কী আশ্চর্য, গুজরাটের সমুদ্রতটে সোমনাথ মন্দিরের শীর্ষে শিবধ্বজ পতপত করে উড়ছে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর আপত্তি সত্ত্বেও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের উদ্যোগে দেশের মানুষের আবেগ বাস্তবায়িত হয়েছে। সেই দৃশ্যটা এখনও চোখের সামনে ভাসছে। সোমনাথ বাস টার্মিনালে আমেদাবাদ যাওয়ার বাসের জন্য অপেক্ষা করছি। একটু পরেই সেই বাস এসে দাঁড়াল, দেখলাম ড্রাইভার সাহেব মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকিয়ে দু'হাত জোড় করে প্রণাম করছেন। এই যে আবেগ, মঙ্গলময়ের প্রতি আস্থা, এটাই ভারতীয় সত্তা, অস্মিতা। শ্রীরামচন্দ্র এই অস্মিতারই প্রতীক। রামমন্দির নির্মাণ আন্দোলন এই অস্মিতাকে রক্ষা করারই সংগ্রাম। উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে হিন্দুসমাজকে বিভক্ত করার চেষ্টা তাই রাষ্ট্রদ্রোহিতার নামান্তর। মা দুর্গাকে ভাঙিয়ে ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করার মতো অপচেষ্টা হিন্দু সমাজ ঘৃণার সঙ্গেই বারবার প্রত্যাখান করেছে, এবারও করবে। এখানে রাম শিবকে পূজা করেন, শিব রামকে—সৃষ্টি হয় রামেশ্বর।

রাম দেবী দুর্গার স্তুতি করেন, দেবী রামের রাবণবধের সংকল্পকে রক্ষা করেন। রাবণ পূজার প্রশ্নই তো উঠে না। তবে? রাজনীতির জন্য, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জাতিসত্তাকে, রাষ্ট্রীয় অস্মিতাকে খুন করতেও দ্বিধা করব না? আবার ৪৬-৪৭-এর পুনরাবৃত্তি চাইছি? ■

সনাতন রায়

ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল।

সুকুমার রায়ের হ য ব র ল-এর সেই ভোল পাল্টানো বেড়ালকে তার আসল পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলে সে গোঁফের আড়ালে নকল গাম্ভীর্য বজায় রেখে উত্তর দিয়েছিল—"বেড়ালও বলতে পার, রুমালও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পার।"

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর এখন হয়েছে ওই বেড়ালের দশা। কখন রুমাল হচ্ছেন আর কখন বেড়াল হচ্ছেন, বোঝা ভার। ২০১১-য় ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তিনি পদে পদে প্রমাণ রেখেছেন, তিনি ইসলাম ভক্ত। যত দিন এগিয়েছে, তিনি ততই বেশি করে সংখ্যালঘুদের মসীহা হয়ে উঠেছেন। প্রায় বোরখার মতো বস্ত্রখণ্ডে নিজেকে আপাদমস্তক আবৃত করে নমাজ পাঠ করেছেন। আল্লার দোয়া মেঙেছেন। ইফতার পার্টিতে তাঁর মুসলমান ভাইদের সঙ্গে একথালায় বসে বিরিয়ানি চেখেছেন। সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের যখন বাংলাদেশ ঠাঁই দিচ্ছে না, তখন মাননীয়া তাদের হাত ধরে এনে বসিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে। কেন্দ্রীয় সরকার যখন বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ভারতছাড়া করতে উদ্যত, তখন তিনি ওই অনুপ্রবেশকারীদের ঠাঁই দিতে ব্যাকুল। তিনি মুসলমান ইমামদের স্বেচ্ছায় ভাতা দিচ্ছেন। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ স্কলারশিপ দিচ্ছেন অবলীলায়। মন্ত্রীসভায় তাঁর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র ফিরহাদ হাকিম। যাকে তিনি শুধু একাধিক মন্ত্রিত্ব নয়, কলকাতা শহরের ঐতিহ্যমণ্ডিত মেয়র পদের জন্য মনোনীত করেছেন। তিনি কখনও গোমাতা হত্যার বিরোধিতা করেননি। কিন্তু কখনও এ রাজ্য থেকে গোরু পাচারের বিরুদ্ধাচারণ করেননি এবং তিনি কখনও অস্বীকার করেননি যে, তাঁর শাসনকালেই পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুততম এবং ওই জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ মুসলমান সম্প্রদায়।

নমাজ ছেড়ে চণ্ডীপাঠ
তৃণমূল নেত্রীর নতুন রাজনীতি

এখানেই শেষ নয়। তাঁর প্রশাসনে পুলিস হেলমেটবিহীন হিন্দু বাইক-চালককে জরিমানা করে, গ্রেপ্তার করে। কিন্তু মুসলমান ভাইয়েরা হেলমেট না পরেই অবলীলায় গোটা সংসার বয়ে নিয়ে যায়। তাঁর প্রশাসনে মুসলমান নরখাদকের হাতে জনৈক ক্রিশ্চান মহিলা ধর্ষিতা হলে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, 'ওটা ছোট ঘটনা' এবং ওই অপরাধী গা ঢাকা দিয়ে থাকে মাসের পর মাস। তাঁর আমলেই সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ধরা পরে এরাজ্যে এবং দেখা যায়, সন্ত্রাসবাদীরা সকলেই মুসলমান। কলকাতা সহ ভারতবর্ষের প্রায় সব বড়ো বড়ো শহরে ভাগাড়ের মাংস পাচার করে ধরা পড়ে যে দুর্বৃত্ত, সেও একজন মুসলমান। বিষমদ বিক্রি করে এখন যাবজ্জীবন জেল খাটছে যে অপরাধী সেই খোঁড়া বাদশাও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। বলাই বাহুল্য, মুখ্যমন্ত্রী এসব ক্ষেত্রে কোনও 'ভাষণ' দেন না। বদলে দিলদরিয়া দু'হাতে বিষমদে মৃত প্রতিটি হতভাগ্য পরিবারের হাতে পৌঁছে যায় কড়কড়ে দু'লক্ষ টাকা যার অধিকার জনগণের, কোনও ব্যক্তির নয়।

কিন্তু হঠাৎ করে তিনি রচনা করে ফেলেছেন আর একটি হ য ব র ল। হঠাৎই তিনি ধরাচুড়ো ছেড়ে দুর্গানাম জপতে শুরু করেছেন। প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে বলছেন, "ওদের (বিজেপির) রাম আছে। আমাদের (তৃণমূলের) দুর্গা আছে।" পুরোপুরি হ য ব র ল-র দ্বিতীয় খণ্ড। তবে চন্দ্রবিন্দুটা ছাড়া। ওটা বলা যাবে না। বলা যায় না 'আমার মৃত্যু কামনা করা হচ্ছে'—এই অভিযোগ তুলে হয়তো মামলাই করে বসলেন। অতএব চন্দ্রবিন্দু (ঁ) টা উহ্য রাখাই শ্রেয়।

দিদিমণি ভেক পাল্টেছেন। মক্কার কাবা ছেড়ে তিনি এখন ফুল ছড়াচ্ছেন দুর্গামন্দিরে। আল্লার হাত ছেড়ে ভগবানের হাত ধরেছেন। কখনও আউরাচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, কখনও সরাসরি দুর্গাস্তোত্র। তবে রামের নাম স্পর্শ করছেন না। কারণ ওটা অশুচি, অশুদ্ধ। তাঁর যুক্তি— দুর্গা যার পুজ্য, রাম তার পুজ্য হবে কীভাবে ? রামই তো অকাল বোধনে দুর্গামায়ের পুজা করেছিলেন। অতএব বড়ো তো দুর্গাই। রামকে মানবেন কোন দুঃখে। ওটা নিয়ে সুখে থাকুক বিজেপি—ভাবখানা এমনই।

এই ভেক বদলের কারণ?

কারণ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ভয় পেয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, ভোটের স্বার্থে ধর্মের খেলাকে লুডোর ঘুঁটি বানিয়ে সাপের মুখে পড়তে চলেছেন। এখনই দান বদল দরকার। সংখ্যালঘু নামক হাতের তাসটি ক্রমশই তাঁর ভোটের তাসটাকে গুলিয়ে দিচ্ছে

কীভাবে?

মুখ্যমন্ত্রী নিজেও জানেন এবং বিশ্বাসও করেন, ২০১১ সালের নির্বাচনে তিনি বামফ্রন্টকে মুছে দিয়েছিলেন নঞর্থক ভোটে, সদর্থক ভোটে নয়। কারণ মানুষ তখন ৩৪ বছরের বামশাসনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি চাইছিল। হাতের সামনে মজুত ছিল একটাই শক্তি— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষ ঢেলে তাঁকেই ভোট দিয়েছিল। তখনও পর্যন্ত তেমনভাবে মুসলমান তোষণের ভূমিকায় তাঁকে দেখা যায়নি। কিন্তু ক্ষমতার মদমত্তে মমতা পর পর এতগুলি ভুল চাল খেললেন যে, শিক্ষিত শহুরে হিন্দু জনগণ বুঝে গেলেন, এই মমতার ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী নয়। দিন যত গড়িয়েছে, মমতার ওপর মানুষের বিশ্বাস ততই কমেছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তখনই ঝুঁকেছেন মুসলমান তোষণের দিকে। কারণ রাজনৈতিক সমীকরণে ভারতবর্ষের মুসলমান ভোটাররা একটা বড় ফ্যাক্টর চিরকালই। অতএব ২০১৬-র নির্বাচনে তিনি প্রকাশ্যে খেললেন মুসলমান তাস। প্রশ্রয় দিলেন মাত্রাতিরিক্ত।

এরই মধ্যে দেখা গেল বিজেপির শক্তিসঞ্চয়ের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। রাজনৈতিক ভাবে এ রাজ্যে বিজেপি-র প্রকাশ্য প্রকোপ এখনও পর্যন্ত ভয় পাওয়ার মতো কিছু নয়। কিন্তু মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বুঝে গেছেন, ভারতবর্ষের ভোট কাহিনি যতটা না রাজনৈতিক, তার চেয়ে অনেক বেশি আবেগ সর্বস্ব। অতএব গেরুয়াবাদী বিজেপি যখন প্রকাশ্যেই হিন্দু ভোটের ভাগীদার, তখন পশ্চিমবঙ্গও আর পিছিয়ে থাকবে না। বিশেষ করে কংগ্রেস এবং সি পি এম দুটি দলই যখন শূন্যে পরিণত হয়েছে, সেখানে মানুষের হাতে একমাত্র বিকল্প শক্তি বিজেপি। সেই বিকল্পের সন্ধানে প্রতিদিনই জোরদার হচ্ছে বিজেপি। যখন তথাকথিত সেকুলার ভোটাররাও দেখতে পাচ্ছেন, তৃণমূল নেত্রীর মাত্রাজ্ঞানহীন মুসলমান তোষণের নীতি গোটা রাজ্যটাকে সংখ্যালঘুদের হাতে তুলে দিচ্ছে, সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে শান্তিপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গ। মুসলমান জনগণ এমনিতেই জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতির ধার ধারে না। তার ওপর রয়েছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী যারা মূলত পাকিস্তানের চর হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মাটিকে ব্যবহার করছে সন্ত্রাসবাদীদের গোপন আস্তানা হিসেবে। ফল হয়েছে মারাত্মক। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২০১৫ সালে ছিল ৯৪.১ মিলিয়ন। মাত্র একবছরের মধ্যে ২০১৬ সালে তা বেড়ে হয় ৯৪.৯ মিলিয়ন। ২০১৭-য় তা হয় ৯৫.৪১৬ মিলিয়ন। অনুমান করা হচ্ছে ২০১৩ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৯৫.৮৯৯২ মিলিয়ন। হিসেব করে দেখা গেছে, ২০১৩ সাল থেকে প্রতি বছর গড়ে ৭.৪৮ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বেড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এর সিংহভাগ বৃদ্ধিই হয়েছে ২০১৬-র পর। এবং এর কারণ মুসলমানদের অনুপ্রবেশ। সমীক্ষা মতে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২৭.১ শতাংশ। এখন তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৪ শতাংশ। যে জেলাগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকোপ বর্তমানে সবচেয়ে বেশি সেগুলি হলো উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া এবং কলকাতা। যেসব জেলায় হিন্দু জনসংখ্যাকে ছাপিয়ে গেছে মুসলিম জনসংখ্যা সেগুলি হলো মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর দিনাজপুর। মালদায় মুসলমান জনসংখ্যা ৫১% মুর্শিদাবাদে ৬৬ শতাংশ, উত্তর দিনাজপুরে ৬০ শতাংশ। বলাই বাহুল্য যে পশ্চিমবঙ্গই হলো ভারতবর্ষের একমাত্র রাজ্য যেখানে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে মুসলমান জনসংখ্যা। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেছেন, যদি এই হারে মুসলমান জনসংখ্যা বাড়তে থাকে তাহলে ২০২০ সালেই বহু জেলায় হিন্দু জনসংখ্যাকে ছাপিয়ে যাবে সংখ্যালঘু জনসংখ্যা।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ এখন ক্রমশ ভীত, সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছেন। বুঝতে পারছেন, এক চরম সর্বনাশের শিকার হতে চলেছেন তাঁরা। হয়তো সেদিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন এপার বাংলার হিন্দুদের ওপার বাংলার হিন্দুদের মতোই নিত্যদিন মুঘলি অত্যাচার সইতে হবে। মা-বোনেদের নিপীড়িত হতে হবে এবং একদিন ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হতে হবে। অতএব ধীরে ধীরে হলেও এরাজের 'হিন্দু জাগরণ' এখন প্রতিদিন বাস্তব চেহারা নিচ্ছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে ক্ষুদ্র পিঁপড়েও রুখে দাঁড়ায়। বাংলার জনগণেরও দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে। এবার তাঁরা রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত।

এই সংকেতটা পাওয়া গিয়েছিল গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেই। এখন তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর তাই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও ঝড়ের অশনি সংকেত বার্তা পেয়েই আল্লা ছেড়ে দুর্গানাম জপতে শুরু করেছেন। হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী জনগণের কাছ থেকে আগেই চেষ্টা করেছিলেন নিবেদিতা আর স্বামী বিবেকানন্দকে কেড়ে নিতে। সেটা বুমেরাং হয়েছে। রামকে কাড়ার চেষ্টা করেননি, কারণ ওটা ছুঁলেই তাঁকেও বিজেপি হতে হবে। অতএব জপ দুর্গানাম।

এবার দুর্গাপুজোর যখন রাজ্য সরকার প্রতিটি পুজোয় দশ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান দিল, তখনই একটা আন্দাজ করা গিয়েছিল। গোটা রাজ্যের দুর্গাপুজোগুলোকে এবছর দখল নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। দুর্গাপুজোকে ঘিরে মুখ্যমন্ত্রী এমনই উৎসাহের সঞ্চার করলেন যে নিজেই তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে মহালয়ার বোধনের আগেই দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করতেও দ্বিধা করেননি। জলাঞ্জলি দিয়েছেন ধর্মীয় নিয়ম, অনুশাসন এবং ঐতিহ্যকেও।

এখন দিনের আলোর মতই পরিষ্কার—এসবই হলো তাঁর 'হিন্দু' সাজার নাটক। হিন্দু না সাজলে এবার যে হালে পানি মিলবে না, জেলায় জেলায় ঘুরে কান পেতে তা তিনি বুঝে গেছেন। অতএব লাও খোল-করতাল। লাও গোবরজল, গঙ্গাজল। লাও আম্রপল্লব, শঙ্খ আর পুষ্প। রাজ্যটাকে বিজেপির ধোঁয়া থেকে পবিত্র কর।

কী চরম মূর্খতা! রাজ্যের মানুষকে কী তিনি এতই মূর্খ মনে করেন? অথবা মনে করেন ভুলোমনা মানুষ তাঁর এতদিনের সংখ্যালঘু তোষণের চরম নির্লজ্জতা ভুলে যাবে রাতারাতি? মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিটি কথা, প্রতিটি পদক্ষেপ যে সুচারু ধান্দাবাজি রাজনীতি, তা কি মানুষ

এত সহজে বিস্মৃত হতে পারে?

মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক স্বার্থের লোভে ঘন ঘন নীতি বদলানো নতুন কোনও ঘটনা নয়। যেমন নতুন কিছু নয়, নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ষিতা মূক ও বধির মেয়ে ফেলানি বসাকের মতো অসংখ্য চরিত্রকে কাজ মিটে যাবার পর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। এটাই তাঁর কৌশল এবং তা করে যান অবলীলায়। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন—'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়।' এই প্রবাদ বচনকে শিরোধার্য করেই তিনি ১৯৮০ সাল থেকে আজ অবধি রাজনীতির নৌকা বেয়ে চলেছেন।

আর তাই আজ রাতারাতি ইসলামকে ছুঁড়ে ফেলে হিন্দুত্বের পৈতা ধারণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। কারণ উনি বুঝেছেন, এবার নিজেকে না বদলালে ২০১৯-এর ভোটবাজারে তাঁর উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো, নিজেকে হিন্দু প্রমাণ করতে মরিয়া মুখ্যমন্ত্রী দুর্গানাম জপতে গিয়ে রামকে অস্বীকার করে ফেললেন। একবারও বুঝলেন না, দুর্গার শরণ নিতে গিয়ে রামকে অস্বীকার করা মানে হিন্দু ভাবনা এবং ভাবাবেগকে অস্বীকার করা। অস্বীকার করা হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণকে। এমনকী রামায়ণের যে চরিত্র হিন্দু নারীর আদর্শ সেই সীতাকেও অস্বীকার করা। ছোট করা। অপমান করা। কারণ রাম-সীতা শুধু দুটি চরিত্র নয়, হিন্দু জনসমাজের আদর্শ দাম্পত্য জীবনের ধর্মীয় প্রতীক। রাম আদর্শ প্রশাসকের প্রতীক। রাম মর্যাদা পুরুষোত্তম।

আসলে তাঁর কাছে শিব-দুর্গা, রাম-সীতা কিংবা কৃষ্ণ-রাধা, কারোরই কোনও মূল্য নেই। আজ তিনি হিন্দুধর্মের তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্য থেকে দুর্গাকে নিয়ে রাজনীতির জল ঘোলা করতে চাইছেন। হয়তো নিজেকেই তিনি দুর্গা ভাবতে শুরু করেছেন। কিন্তু আজ যদি বিজেপি দুর্গাকে নিয়ে মাতামাতি শুরু করে, তাহলে নিশ্চিত তৃণমূল নেত্রী দুর্গাকে ছুঁড়ে ফেলে কালীকেই বরণ করবেন। কারণ তাঁর কাছে বিজেপি-র সব কিছুই পরিত্যাজ্য। অন্তত ততক্ষণ, যতক্ষণ না তিনি সর্বভারতীয় স্তরে রাজনীতির পাঁকে হাবুডুবু খাচ্ছেন। তখন কিন্তু তিনি নির্লজ্জতার শেষ সীমায় পৌঁছেও বিজেপির গেরুয়া বর্ণকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বর্ণ হিসেবে শিরোধার্য করে নেবেন। তখন তাঁর 'রংধনু'ও রাতারাতি 'রামধনু' হয়ে যাবে এতে কোনও সন্দেহ নেই।

আসলে রাজ্য জুড়ে বড়ো বড়ো কাটআউটে তিনি যতই নিজেকে সততা ও আদর্শের প্রতিমূর্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করুন না কেন, পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি অনুসরণ করে যতই তিনি নিজের প্রশংসাধর্মী স্লোগান দলীয় কর্মীদের মুখস্ত করিয়ে 'দেবী' সাজার চেষ্টা করুন না কেন, তিনি কোনভাবেই জবাব দিতে পারবেন না, কোন সততার আদর্শ অনুসরণ করে লালুপ্রসাদ যাদবের মতো ডাকাত রাজনীতিবিদের হাত ধরার জন্য আঁকুপাকু করেন? কোন রাজনৈতিক নিষ্ঠা থেকে জঙ্গলমহলের একদা পরিত্রাতা ছত্রধর মাহাতোকে বছরের পর বছর জেলবন্দি করে রাখেন? আর কোন রাজনৈতিক নীতি থেকে সুচিত্রা মাহাতোর মত উচ্চশিক্ষিতা নারীকে ঠেলে দেন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে! সোনালি গুহর মতো ছায়াসঙ্গিনীকে দু'হাতে ঠেলে দেন আবর্জনার মতো?

সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদরাই সুবিধার সুযোগ নিতে নিতে শেষ পর্যন্ত ভুলটাকেই জীবনের আদর্শ করে তোলেন। আর তখন সাত দু'গুণে যে চৌদ্দ হয় সেটাও ভুলে যান। হিসেব কষেন "সাত দুগুণে চৌদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।

আসলে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো হলেন সুকুমার রায় সৃষ্ট সেই শ্রীকাকেশ্বর কুচকুচে---৪১নং গেছোবাজার, কাগেরাপট্টির বাসিন্দা যিনি অনেক হিসেব কষেই বলেন 'চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ আর রুমালের মা—হলো চশমা।' যিনি বিজ্ঞাপন দিয়ে বলতে পারেন, "আমরা সনাতন বায়স বংশীয় দাঁড়ি কুলীন অর্থাৎ দাঁড়কাক। আজকাল নানা শ্রেণীর দাঁড়িকাক, হেড়ে কাক, রামকাক প্রভৃতি নীচশ্রেণীর কাকেরাও অর্থলোভে নানারূপ ব্যবসা চালাইতেছে। সাবধান, তাহাদের বিজ্ঞাপনের চটক দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না।"

কাকেশ্বর কুচকুচেরূপিনী তৃণমূল নেত্রী এখন কুলীন সেজেছেন। নমাজ ছেড়ে চণ্ডীপাঠ করেছেন। আর সাবধান করছেন মানুষকে—"বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। ওরা দাঙ্গা বাধায়। ওরা ঝগড়া করে। ওদের ভাষণে ভুলবেন না।" অবস্থা এতটাই সঙ্গিন যে কন্যাশ্রী প্রকল্পের অর্থপ্রাপ্তি ঘটেছে এমন ছাত্রীদেরও হাতে-পায়ে ধরে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হচ্ছে—"বাবা-মাকে বোঝাও, বিজেপিকে যেন ভোট না দেন।" হয়তো এই মুখ্যমন্ত্রীই ২০১৯-এর ভোটের পর অতীতের মতোই নির্দ্বিধায় বলবেন—আমার কাছে কোনও রাজনৈতিক দলই অচ্ছুত নয়—এমনকী বিজেপি-ও নয়। বলবেন এবং পুনরায় রেলমন্ত্রকের দাবি জানিয়ে নতুন রাজনীতির প্রতীক রামকে আঁকড়ে ধরবেন।

আসলে তিনি কোথায় কখন আছেন কেউ জানে না। সুকুমার রায়ের গেছোদাদাকে খুঁজতে গেলে যেমন হিসেবে করে দেখতে হয় "দাদা কোথায় কোথায় নেই। তারপরে দেখতে হবে, কোথায় কোথায় থাকতে পারে। তারপরে দেখতে হবে, দাদা এখন কোথায় আছে। তারপর দেখতে হবে, হিসেব মতন যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছবে, তখন দাদা কোথায় থাকবে।" আমাদের দিদিও তেমনি। কখনও রামে, কখনও বামে। কখনও ডানে, কখনও তৃণে। কখনও মদজিদে, কখনও মন্দিরে। সম্প্রতি আবার জঙ্গলমহলে গিয়ে ক্রিশ্চানদেরও গুণগান গেয়ে এসেছেন। তিনি আসলে হিজবিজবিজ। তাঁর নাম হিজবিজবিজ, ভাইয়ের নাম হিজবিজবিজ, পিসির নাম হিজবিজবিজ, বাবার নাম....। সুবিধাবাদী রাজনীতির সুবিধা এটাই।

কিন্তু সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদরাই সুবিধার সুযোগ নিতে নিতে শেষ পর্যন্ত ভুলটাকেই জীবনের আদর্শ করে তোলেন। আর তখন সাত দু'গুণে যে চৌদ্দ হয় সেটাও ভুলে যান। হিসেব কষেন "সাত দুগুণে চৌদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।" ■

‘আমাদের দুর্গা, ওদের রাম’

প্রীতীশ তালুকদার

আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে এই বাংলার নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে পবিত্র গঙ্গার তীরে বসে বাংলায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন বাঙ্গালি কবি কৃত্তিবাস ওঝা। এপার-ওপার বাংলার হিন্দুর ঘরে ঘরে আজও সেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমাদৃত। তা উনি জানেন কি? বাংলার কাব্য, সাহিত্য, গল্প, কবিতা রামকাহিনিতে ভরা। সেই অজানা প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার গ্রামগুলো রাম

গান, রাম রসায়ন গানে মুখরিত হয়ে আসছে। আজও ঘরে শিশু জন্মালে মা-বাবারা বুকভরা আশা ভক্তি ও ভালোবাসা নিয়ে তার নাম রাখে রাম, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, লব, কুশের নামে। আজও বাংলার অখড়া-আশ্রম সকাল-সন্ধ্যায় সাধু-সন্তদের সমস্বরের রামনামে মুখরিত হয়। রামভক্ত তাই হনুমানকে দুটো কলা কিনে খাইয়ে এই বাংলার মানুষ আজও তৃপ্ত হয়, হনুমানের মৃতদেহ সাড়ম্বরে সৎকার করে। আজও বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম মন্ত্রে প্রতি সন্ধ্যা উদ্বেলিত। বাংলার ভিক্ষুকেরা জয় শ্রীরাম নাম নিয়ে গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হয়। আজও পালা-পার্বণে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে মঞ্চ বেঁধে ‘সীতার বনবাস’, ‘লবকুশ’ যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হয় আর তাতে আবেগাপ্লুত গ্রাম্য মায়েরা আঁচলের কোণে চোখের জল মোছে তা বঙ্গেশ্বরী মমতা দিদি জানেন কি? তা উনি না জানতেই পারেন; তাছাড়া তৃণমূলি রাজনীতি তো মুলিডান্ডা নির্ভর। জানায় কী কাম?

‘রাম বাংলার সংস্কৃতি নয়’, ‘ওরা বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে, অশান্তি করতে বাইরের কালচার আমদানি করছে’, ‘রাম দুর্গাপূজা করেছিল, তাই রামের চেয়ে দুর্গা বড়’, ‘ওরা রামের পুজো করে আর আমরা দুর্গা পূজা করি’— মহান বক্তাটি কে তা আশা করি কারও বুঝতে অসুবিধা হবে না। মাথায় ঘোমটা টেনে কান বের করে সামনে হাত বাড়িয়ে মোনাজাতের ঢং করে মোমিন মুসলমানি সেজে সেজে আজকাল ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে মাঝে মাঝে হিন্দুত্ব জাহির করা শুরু করেছেন উনি। কত বড় খাঁটি হিন্দু তা দেখাতে গিয়ে এমন সরস্বতী প্রণাম মন্ত্র শোনালেন যে তাতেই বোঝা গেছে ওঁর সরস্বতী বন্দনার কোনও প্রয়োজনই নাই, স্বয়ং দেবী সরস্বতী ওঁর উপর ভর করেই আছেন! কোন কোন দেবদেবীর পূজা করেন বলতে গিয়ে ‘বিষ্ণুমাতা’র আবিষ্কার করেও দেখালেন। যিনি সিধু-কানু ডহরে ডহরবাবুকে আবিষ্কার করেন, রাকেশ রোশনকে একেবারে চাঁদে পাঠিয়ে দেন, সেই তিনি যে অমন কথা বলবেন তাতে আর আশ্চর্য কী! প্রশ্নটা হলো, একজন রাজনৈতিক নেত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেন রাম ও দুর্গার বিভাজন নিয়ে পড়লেন?

রাজনীতিতে ভেদ বা বিভাজনটা এক বড় অস্ত্র। ভারতে বহুদলীয় রাজনীতি চলে মানুষের ভোটের ভিত্তিতে এবং ভোট তিন, চার, পাঁচ বা তারও বেশি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। সেই ভাগাভাগিতে জিতে গদিতে পৌঁছানোর জন্য কত ভোট দরকার? একশোটার মধ্যে চল্লিশ, বিয়াল্লিশ বা পঁতাল্লিশটা। পশ্চিমবঙ্গে ত্রিশ শতাংশ মুসলমান ভোট। তারা ধর্মীয় স্বার্থভিত্তিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। মুসলমান তোষণ করে সেই ত্রিশ শতাংশে পকেটে, বাকি চাই দশ থেকে পনেরো শতাংশ। সেটা অচেতন হিন্দুর কাছ থেকে আপনিই এসে যায়, এসে গেছে।

এখন সমস্যা হলো বিজেপি দেশের উনিশটা রাজ্য-সহ দিল্লি তো দখল করেই ফেলেছে, পশ্চিমবঙ্গেও থাবা বসাচ্ছে। বিগত নির্বাচন- গুলোতে উত্তরোত্তর ভোট বৃদ্ধি করে বামফ্রন্টকে পিছনে ফেলে বঙ্গের বিরোধী দল হয়ে উঠেছে বিজেপি। যার পিছনে কারণ হলো, এই তৃণমূল সরকারের নির্লজ্জ মুসলমান তোষণে এ রাজ্যের হিন্দুদের অসহায় বোধ করা। সঙ্গে কালিয়াচক, উলুবেড়িয়া, বসিরহাটের মতো অজস্র ঘটনায় ইসলামিক হিংসা এবং তাতে তৃণমূল নেতাদের জড়িত থাকা ও সরকারের প্রশ্রয়। ত্রিশ শতাংশ মুসলমান ভোট তেমন কোনও কাজে আসবে না। আর তা না এলে সামনে ২০১৯-এর লোকসভায় অন্তর্জলি শুরু হয়ে ২০২১-এর বিধানসভায় তৃণমূলের গঙ্গাযাত্রা পূর্ণ হয়ে যাবে।

দুর্গা পূজায় বাধা, বিসর্জনে বাধা, হিন্দু ধর্মীয় যা কিছু করতে যাও তাতেই অনুমতির কড়াকড়ি আর নানান হ্যাপা। হিন্দু ধর্মে, মন্দিরে আঘাত, প্রতিমায় আঘাত। সঙ্গে ইসলামিক উগ্রবাদের দাপাদাপি, জেহাদি সন্ত্রাসের রক্তচোখ। ভীত আতঙ্কিত বঙ্গের হিন্দু। যারা সর্বস্ব হারিয়ে ওপার বাংলা থেকে এসে একটু হাঁফ ছেড়েছিল তাঁদের সামনে ফের সিঁদুরে মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে। হিন্দু বিদ্বেষ করে মতুয়া তোষণ শিকড় কেটে আগায় জল ঢালার মতো আর কাজে আসছে না। দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে চলা কংগ্রেস ও বাম দলগুলোর ভোট কাটাকাটির ক্ষমতা একেবারে শেষের দিকে। তারা আর হিন্দু ভোটকে কাটাকুটি করে ছড়িয়ে দেবার জায়গায় নাই। বিজেপিকে আর এখানে হিন্দু সাম্প্রদায়িক বলে লাভ নাই, বরং ক্ষতি। তাই বাঙ্গালি কালচারের ধুয়ো তুলে হিন্দুর দেবতা ভাগ। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা— তার মধ্যে বাঙ্গালির ক'টা ও কে কে, বিহারির ক'টা ও কে কে, গুজরাটির ক'টা ও কে কে তা কোনও দিন ভাগ করতে দেখেছেন? উনি ভাগ করে দিচ্ছেন, আপনারা মান্য করুন; প্রশ্ন করবেন না। প্রশ্ন করলে অবশ্যই আপনি মাওবাদী বা হার্মাদ। ■

বালুরঘাটে জাতীয়তাবাদী নাগরিক মঞ্চের সভা

গত ২ ডিসেম্বর জাতীয়তাবাদী নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট শহরের নাট্যতীর্থ মন্মথ মঞ্চে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বিষয়ক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিরক্ষা বিষয়ের অধ্যাপক ও গবেষক পার্থ বিশ্বাস, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী সত্যনারায়ণ মজুমদার। আলোচনা সভার উদ্বোধনী বক্তব্যে শ্রীবিশ্বাস বলেন, অসমে নাগরিকপঞ্জিকরণ হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। এর অবধারণাগত ভিত্তি ধরা হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের জেনিভা কনভেনশন। এই কনভেনশনেই অনুপ্রবেশকারী ও শরণার্থীর সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে। তাই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবে আক্রান্ত হয়ে অন্য দেশ থেকে দেশত্যাগে বাধ্য হিন্দুরা শরণার্থী আর মুসলমানরা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলেও সঠিক জনবিনিময় হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে তিনকোটি উদ্বৃত্ত মুসলমান কোথা থেকে এল তার কোনও হিসেব নেই। শ্রীমজুমদার বলেন, এখানে মুসলমান তোষণের ফল হলো কালিয়াচক, দেগঙ্গা, ধুলাগড়, ক্যানিং, তেহট্ট, বসিরহাট। তিনি উল্লেখ করেন, অসমে ক্রমাগত অনুপ্রবেশের ফলে জন ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। তাই সেখানকার সব রাজনৈতিক দল নাগরিক পঞ্জিকরণের দাবি জানায়। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি অসমের চেয়েও মারাত্মক। বালুরঘাটের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার শেষ পর্বে প্রশ্নোত্তর চলে। সভা পরিচালনা করেন শ্রীমতী পায়েল সরকার এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সভার আহ্বায়ক শুভেন্দু কুমার বকসী।

সিউড়িতে পিআইবি-র গণমাধ্যম কর্মশিবির

কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবগত করাতে এবং সেই সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে গত ৩০ নভেম্বর বীরভূমের সিউড়িতে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) কলকাতার পক্ষ থেকে একদিনের গণমাধ্যম কর্মশিবির 'বার্তালাপ'-এর আয়োজন করা হয়। শিবিরে পিআইবি কলকাতার অতিরিক্ত মহানির্দেশক শ্রীমতী জেন নামচু বলেন, এ ধরনের কর্মশিবির আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো গণমাধ্যমের সহযোগিতায় জনসাধারণের কল্যাণে গৃহীত কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলির সুফল সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করে তোলার জন্য আরও বেশি প্রচার করা। সাংবাদিকদের একাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। শিবিরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বিপ্লব

লোহো চৌধুরি, বোলপুরের প্রবীণ সাংবাদিক স্বপন কুমার ঘোষ পিআইবি থেকে প্রকাশিত সংবাদ ও অন্যান্য তথ্য মুদ্রণ ও বৈদুতিন মাধ্যমে কীভাবে কাজে লাগিয়ে ভালো খবর তৈরি করা যায় তার বিশদ ব্যাখ্যা করেন। জেলাস্তরে কর্মরত সাংবাদিকদের কাছে পিআইবি-র বিভিন্ন সংবাদ ও তথ্যের গুরুত্ব উল্লেখ করে কলকাতা কার্যালয়ের উপনির্দেশক অজয় মহমিয়া বলেন, তৃণমূলস্তরের মানুষের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দিতে সরকারি প্রকল্পগুলি সম্পর্কে বিশদ অবগত হওয়া সাংবাদিকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকৃত তথ্য প্রচারে পিআইবি-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রেখে সাংবাদিকদের কাজ করার জন্য আবেদন জানান তিনি। জেলার অগ্রণী রাষ্ট্রায়ত্ত ইউকো ব্যাঙ্কের ম্যানেজার রত্নাকর কুণ্ডু কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন আর্থিক প্রকল্পের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে বীরভূম জেলায় নতুন শিল্প স্থাপনে তাঁর ব্যাঙ্কের ভূমিকার কথা বর্ণনা করেন।

কর্মশিবির পরিচালনা করেন শ্রীমতী শ্রীজাতা সাহা সাহু এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্রাট বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিকিমে সংস্কৃত কথোপকথন প্রশিক্ষণ শিবির

গত ২১ থেকে ৩০ নভেম্বর সংস্কৃত ভারতী, চিন্ময় মিশন ও কাঞ্চীকামকোটি পীঠের বেদ বিদ্যাপীঠের উদ্যোগে সিকিম প্রদেশের রাজধানী গাংটকের জালিপুল স্থিত চিন্ময় মিশনে দশদিনের সংস্কৃত কথোপকথন প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে কুড়িজন মা-বোনসহ মোট ৪৪জন

অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে বিজ্ঞানী, রাজ্য সরকারের সচিব, অবসরপ্রাপ্ত বিশিষ্ট পদমর্যাদার অফিসার, অধ্যাপিকা, রাজ্যপালের চিকিৎসকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। অসম থেকে আগত ফণীন্দ্র গৌতম প্রশিক্ষণ দেন। ৩০ নভেম্বর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিকিম প্রদেশের রাজ্যপাল গঙ্গাপ্রসাদজী। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, সংস্কৃতের মধ্যে ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির বিশিষ্ট পরম্পরা ও জ্ঞান নিহিত রয়েছে। সংস্কৃত ভারতের ভাষাসমূহের জননীস্বরূপা। এমনকি বর্তমানে ভাষার বৈজ্ঞানিকতা, সংগণকের উপযোগী ভাষার ভূমিকা সংস্কৃতের পক্ষে সম্ভব। পাশ্চাত্যের গবেষকরাও এসব স্বীকার করে নিয়েছেন। রাজ্যপাল সিকিমে সর্বত্র আরও বেশি করে সংস্কৃত প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়ে রাজ্যজুড়ে সংস্কৃতকে জনমনে প্রচার ও প্রসারের জন্য আবেদন জানান। সংস্কৃত ভারতীর উত্তরবঙ্গ সংগঠন সম্পাদক কমল শর্মা রাজ্যপালকে সিকিমে প্রাথমিক স্তর থেকে সংস্কৃত পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে আবশ্যিক করা, রাজ্যে সংস্কৃত অ্যাকাডেমি স্থাপন ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষকদের যথাযোগ্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ ও আবেদন জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের সংস্কৃত শেখার সুন্দর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। শেষে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে প্রাক্তন ডিজি (নাগাল্যান্ড পুলিশ) ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সিকিমের সভাপতি সি পি গিরি ধন্যবাদ জানান।

কলকাতায় কল্যাণ ভবনে বিরসা স্মরণ

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের কলকাতা-হাওড়া মহানগরের উদ্যোগে জনজাতি মহাপুরুষ তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুণ্ডার ১৪৩তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয় কল্যাণ ভবনে গত ২৫ নভেম্বর। এই অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয় ভারতমাতা, বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বালাসাহেব দেশপাণ্ডে ও বিরসা মুণ্ডার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। কলকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতির একজন করে কার্যকর্তা চিরস্মরণীয় জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা ও কবিতাপাঠ করে অনুষ্ঠানের ভাব ও মাত্রা বৃদ্ধি করেন। বিশিষ্ট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব আন্দোলন কর্মী ও শিক্ষাবিদ পরেশ নন্দ বিরসা মুণ্ডার জীবনচরিত স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা করেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা-চেতনার আদর্শে আধুনিক ভারত গঠনের জন্য কল্যাণ আশ্রমের যে কর্মকাণ্ড চলছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। কল্যাণ আশ্রমের বিবিধ কর্মকাণ্ড এবং আগাম কর্মসূচি নিয়ে যুক্তিনিষ্ঠ পর্যালোচনা করেন সংগঠনের প্রাদেশিক সংগঠক মহাদেব গড়াই।

পরম্পরা

মিত্র সপ্তমী—সূর্যস্নানের একটি নাম

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সুখ কখনও হয় না নিরন্তর। দেবতাদেরও। তাঁদেরও জীবনে বারেবারেই নেমে আসে অ-সুখের কালোরাত্রি। স্বর্গের অধিবাসী হয়েও সেখানকার সিংহাসন হাতছাড়া হয় সুরেন্দ্রর। দেবরাজ্য দখল করে অসুররা। আর তাদেরই ভয়ে স্বর্গ ছেড়ে পালান দেবতারা। দীন-দুঃখীর মতোই ঘুরে বেড়ান পথেঘাটে। কখনও বা লুকিয়ে পড়েন পাহাড়ে কন্দরে।

সেবারও হলো তাই। স্বর্গহারা দেবতারা তখন সাধারণ মানুষের মতোই দিশেহারা। কী করবেন বুঝতে পারেন না তাঁরা। সেই বুঝতে না-পারার যন্ত্রণাতেই কেমন যেন উদ্যমহীন অলস জীবন তখন তাঁদের। অক্ষমের মতো শুধুই দীর্ঘশ্বাস ফেলা।

সন্তানদের এই দুঃখে বিচলিত হন দেবমাতা অদিতি। প্রতিকারের আশায় তিনি করেন সূর্যের আরাধনা। এর আগে মহামায়ার মহাশক্তি স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেও এবার তিনিও যেন নিষ্ক্রিয়। অর তাই সর্বশক্তিমান সূর্যের আরাধনা করতে থাকেন অদিতি।

দেবমাতার সেই সুকঠোর তপস্যায় তুষ্ট সূর্যদেব। প্রবল তেজে প্রদীপ্ত সূর্য আবির্ভূত হন অদিতির সামনে। বলেন, তোমার তপস্যায় তুষ্ট আমি। বলো, কী তোমার প্রার্থনা। তোমাকে অদেয় এমন কিছুই নেই আমার।

অদিতি বলেন, আমার সন্তানরা স্বর্গহারা। প্রবল শক্তিতে অসুররা কেড়ে নিয়েছেন স্বর্গের প্রাণময় সিংহাসন। তাদের ভয়ে সন্তানরা আমার যাপন করছে দীন ভিক্ষুকের জীবন। তাই বিতাড়িত করুন অসুরদের স্বর্গ থেকে। সেখানে আবার প্রতিষ্ঠিত হোক আমার সন্তান দেবতারা। দয়া করে কৃপা করুন।

সূর্য বলেন, তাই হবে। আমি বিতাড়িত করবো অসুরদের ওই অমরালোক থেকে। আর তারই জন্য আসবো আমি তোমার সন্তান হয়ে। সেই রূপেই স্বর্গ করবো অসুর-মুক্ত।

সূর্যের এহেন বরে সুখী মাতা অদিতি অচিরেই হন গর্ভবতী। এবার প্রতীক্ষা অজাতক মার্তণ্ডের জন্য। তারই মঙ্গলের জন্য শুরু হলো উপাসনা। নানা কৃচ্ছ্র সাধনে ক্লিষ্ট হতে থাকেন তিনি।

গর্ভবতী অদিতির ক্রমাগত উপবাস এবং নানা কঠোর তপস্যায় বিচলিত প্রজাপতি কশ্যপ। স্ত্রীকে ডেকে বলেন, এ কী শুরু করেছ তুমি! এভাবে উপোস করতে থাকলে তোমার গর্ভস্থ সন্তানের যে ক্ষতি হবে। এমনকী তোমার গর্ভপাতও হতে পারে। তাই এমন তপস্যা থেকে বিরত হও। তোমার অন্য সন্তানদের কল্যাণের কথা ভেবে, তাদের দুর্দশা দূর করার জন্যই তোমার সুস্থ সবল পুত্র প্রসব করা দরকার।

স্বামীর কথায় হাসেন অদিতি। বলেন, মিথ্যেই ভাবছো তুমি। এসব উপোস ও ব্রতে আমার অজাতক সন্তানের কোনও ক্ষতিই হবে না। বরং এসবই হবে তার পুষ্টির কারণ। তাই দুশ্চিন্তা ছাড় তো তুমি।

অদিতির কথায় চুপ করেন কশ্যপ। মনে অবশ্য একটু খুঁতখুঁতুনি থেকেই যায়। কিন্তু মা অদিতির এমন বিশ্বাস এবং দৃঢ়তা দেখে ভাবেন, তাকে আর এসব নিয়ে বিরক্ত না করাই ভালো। নিবৃত্ত হলেন কশ্যপ। তবুও উদ্বেগ যায় না। সেইভাবেই অপেক্ষা করতে থাকেন তিনি পুত্রের জন্মের জন্য। অবশেষে আসে সেই শুভদিন। মাতৃগর্ভ থেকে অবতীর্ণ হন সূর্য। সুস্থ, সবল এবং অনুপম তার রূপ।

জন্মমাত্রই পূর্ণরূপ। অপেক্ষা না করে দেবতাদের নেতা হয়ে এগিয়ে আসেন অসুর দমনে। তাঁর নেতৃত্বে দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেন অসুরদের। আবার তাঁরা হন স্বর্গবাসী। সেইসঙ্গে কৃতজ্ঞ দেবতারা নানাভাবে অর্চনা করেন সূর্যকে। আর সেইসময় থেকেই নরলোকেও শুরু হয় সূর্য-উপাসনা। সেই উপাসনারই এক সার্থক রূপ মিত্রসপ্তমী।

আসলে শুক্লা সপ্তমী তিথিটি হলো সূর্যের দিন। নানা নামে সূর্য এক এক মাসে এক এক সপ্তমীতে করেন অবস্থান। গ্রহণ করেন সকলের পূজা। ভানু সপ্তমী, রথ সপ্তমী, মিত্র সপ্তমী ইত্যাদি হলো এক এক

মাসে সূর্যের এক এক রূপে অর্চিত হওয়ার দিন। সূর্যকে বলা হয় বিষ্ণুরই এক অবতার।

বিভিন্ন পুরাণেই সূর্যের আবির্ভাবের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। মৎস্য, ভবিষ্য, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণে আছে সূর্যের উদ্ভবের কাহিনি।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাহিনি, সৃষ্টির সেই প্রথম কালে চারদিক ছিল তমসাবৃত। আলোর চিহ্ন ছিল না কোথাও। এমনই এক মুহূর্তে উৎপন্ন হয় পরমকারণ, ক্ষয়রহিত এক সুবৃহৎ অণ্ড। সেই অণ্ডের মধ্যে তখন অবস্থান জগতের স্রষ্টা পদ্মযোনি ব্রহ্মার। একসময় তিনি প্রকাশিত হলেন সেই অণ্ড ভেদ করে। আবির্ভূত ব্রহ্মার মুখ থেকে নির্গত হলো মহানাদ 'ওঁ'। সেই ওঙ্কার থেকে পর্যায়ক্রমে উৎপন্ন হয় 'ভূ', 'ভুবঃ' এবং 'স্বঃ'। এই তিন ব্যাহৃতিই হলো সূর্যের স্বরূপ। ওঁ থেকেই পরমসূক্ষ্ম রূপ সূর্য বা রবির আবির্ভাব। সূর্যের সেই সূক্ষ্মরূপ থেকেই ক্রমে স্থূল থেকে স্থূলতর হয়ে প্রকাশিত হলো 'মহঃ' 'জন' 'তপঃ' এবং 'সত্য' রূপে। ওঙ্কার থেকেই বিবস্বানের স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে সপ্তরূপের উদ্ভব। এমন রূপ সত্ত্বেও ভগবান ভাস্কর কখনও প্রকাশিত, কখনও বা অপ্রকাশিত।

অনন্ত তেজোময় আদিত্যের প্রভাবে চারিদিকের সব জল শুকিয়ে যেতে থাকলে বিব্রত হন ব্রহ্মা। জল ছাড়া তো সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই তিনি নানাভাবে স্তব করতে থাকেন সূর্যের— তাঁর ওই বিপুল তেজোরাশি সম্বরণের জন্য।

ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট ভাস্কর তাঁর পরম তেজ সম্বরণ করে স্বল্প তেজোময় হলেন। আর সেই তেজকে অবলম্বন করেই ব্রহ্মা সমাধা করলেন তাঁর সৃষ্টি কর্ম।

সেই সৃষ্টি পর্বেই ব্রহ্মার পৌত্র কশ্যপ বিয়ে করেন প্রজাপতি দক্ষের অদিতি প্রভৃতি তেরটি মেয়েকে। অদিতি সূর্যকে পুত্র রূপে পাওয়ার বর পেয়ে নানা কঠোর তপস্যা করতে থাকলে তাঁর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে কিছুটা রাগের সঙ্গেই বলেন, তুমি কি এইভাবে নিত্য উপোসী থেকে তোমার গর্ভকে 'মারিত' অর্থাৎ নষ্ট করবে? উত্তরে অদিতি বলেন, এই গর্ভ 'মারি' নাই অর্থাৎ নষ্ট হবে না, বরং এই হবে বিপক্ষের বিনাশের কারণ।

এরপরই জন্ম হয় তেজোময় ভাস্করের। সে রূপ দেখে বিদ্বান কশ্যপ তার স্তব করতে থাকলে ভেসে আসে আকাশবাণী— তুমি এই গর্ভকে 'মারিত' বলেছিলে, তাই তোমার এই পুত্রের নাম হলো 'মার্তণ্ড'।

এই মার্তণ্ডই স্বর্গজয়ী অসুরদের বিনাশের কারণ হন। তারপর মার্তণ্ডই আপন রশ্মিতে চারদিক আলোকিত করে কদমফুলের মতো দীপ্তশালী হয়ে সূর্যের কাজ করতে থাকেন।

পুরাণ ও শাস্ত্রমতে সূর্যের রয়েছে অসংখ্য নাম। এক এক নামে সূর্যের অবস্থান এক এক মাসে— একথা বলা হয়েছে আগেই। মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে সূর্যের অবস্থান মিত্র রূপে। মানববন্ধু তিনি করেন সকলের অশেষ কল্যাণ। আর তাই সূর্যের প্রিয় তিথি শুক্লপক্ষের সপ্তমী। অগ্রহায়ণ মাসে চিহ্নিত মিত্র-সপ্তমী নামে। সারা দেশের অসংখ্য মানুষ এই দিনে উপাসনা করেন সূর্যের। পালন করেন মিত্র-সপ্তমী ব্রত।

এই ব্রত পালনের অঙ্গ হিসেবেই শুক্লা সপ্তমীর সকালে সূর্যোদয়ের আগে কোনও নদী বা জলাশয়ে স্নান করে ষোড়শপচারে করা হয় সূর্যের পূজা। নিবেদন করা হয় নানারকম ফল-মিষ্টি এবং অন্যান্য দ্রব্য। ব্রতীরা এদিন উপবাস করেন। উপবাসকালে শুধুই ফল খান। পরদিন অর্থাৎ অষ্টমীতে মিষ্টি খেয়ে ভঙ্গ করা হয় ব্রত। এই ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে ব্রতীরা দীর্ঘায়ু হন এমনই বিশ্বাস। এই ব্রতের অন্যতম অঙ্গ সূর্যস্নান। বলা হয়, এই দিনে দীর্ঘক্ষণ সূর্যরশ্মি ও তাপ গায়ে লাগানো অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। এতে শরীর ও মন হয় পরিশুদ্ধ। শাস্ত্রমতে, মিত্রসপ্তমী ব্রত করলে সম্পদ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়।

বঙ্গদেশে মিত্রসপ্তমী ব্রত পালনের চল তুলনায় একটু কম। কিন্তু সারা ভারতে এই ব্রত আজও পালন করা হয় সমান উৎসাহ এবং উদ্দীপনায়।

আধুনিক বিজ্ঞানও সুস্বাস্থ্য এবং নানা রোগ থেকে মুক্তির নিদান হিসেবে রোদ গায়ে লাগানোর কথা বলছে। হিন্দুশাস্ত্র কিন্তু বহুশত বছর আগেই এমন একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সূর্যস্নানের বিধান দিয়েছে মানব কল্যাণে। ■

সাংবাদিক চাই

স্বস্তিকা পত্রিকায় অসম এবং ত্রিপুরার খবরের অভাব অনেকদিন ধরেই আমরা অনুভব করছি। আমরা মনে করি ওই দুই রাজ্যে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের জীবনধারণের প্রকৃত ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের কাছে তুলে ধরা দরকার। তাই, ত্রিপুরার আগরতলা এবং উত্তর অসমের শিলচরের যুবক-যুবতীদের প্রতি আমাদের আবেদন, নিউজ রিপোর্টিংয়ে যদি কারও আগ্রহ থাকে তাহলে অবিলম্বে নীচে দেওয়া ঠিকানায় এক কপি পাসপোর্ট-সাইজ ছবি-সহ সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জি পাঠান। জীবনীপঞ্জি ই-মেলও করা যেতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য ফোন করুন সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বরে।

স্বস্তিকা

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

Email : swastika 5915@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বর : ৮৪২০২৪০৫৮৪

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

মারে বার্নসন এমেনিউ (১৯০৪-২০০৫)

তিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ভাষবিজ্ঞানী। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও বার্কলেতে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাপক ছিলেন। সেখানে তিনি সম্মান ও উপাধি সহ আজীবন অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ফরাসি, জার্মান ও ল্যাটিন ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর বিশেষ অবদান হলো তাঁর রচিত বিখ্যাত পুস্তক 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল গ্রামার' এবং ' দ্য স্ট্রাগলিং ফিগ ইন সংস্কৃত লিটারেচার'। তিনি দ্রাবিড় ভাষাসমূহের ওপরও গবেষণা করেন, যার ফলস্বরূপ তিনি 'এ দ্রাবিড়িয়ান এটিমোলজিক্যাল ডিকশনারি' রচনা করেন।

উদ্ধৃতি ঃ এ সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না যে দুই সহস্রাব্দেরও পুরনো ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানই পাশ্চাত্য জগতের ভাষাসমূহের প্রত্যক্ষ উৎসস্থল ছিল।

উৎস ঃ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক এরিয়া— মারে বার্নসন এমেনিউ।

রুডলফ স্টেইনার (১৮৬১-১৯২৫)

ইনি অস্ট্রিয়া নিবাসী প্রখ্যাত স্থপতি, সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব।

উদ্ধৃতি ঃ ভগবদ্গীতায় বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব এতই সূক্ষ্ম যে তাকে বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদের আত্মাকে তার সঙ্গে এক সুরে বাঁধতে হবে।

উৎস ঃ দ্য লর্ডস সঙ্ গীতা -- ড. সন্ত্ কে ভাটনগর।

অ্যাঁদ্রে উইল (১৯০৬-১৯৯৮)

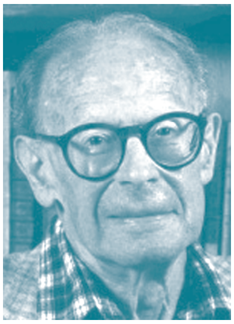

ইনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর বিশ্বের অন্যতম গণিতবিদ। তাঁর অনেক অবদানের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হলো সংখ্যাতত্ত্ব এবং অ্যালজেব্রিক জিওমেট্রিক সংযোগসূত্র আবিষ্কার। প্যারিসের অ্যাকাডেমি অব সাইন্স এবং আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সাইন্সের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। তাঁর অ্যালজেব্রিক কার্ভের গবেষণা 'পার্টিক্যাল ফিজিক্স' এবং স্ট্রিং থিয়োরির গবেষণায় প্রভূত সাহায্য করেছে। তিনি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। মাত্র ষোলো বছর বয়সে পুরো গীতা অধ্যয়ন করেন।

উদ্ধৃতি ঃ ভারতীয়দের মধ্যে রয়েছে অসীম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাবনা এবং অচিরেই ভারত বিশ্বের গণিত সাম্রাজ্যে সম্মানের স্থান লাভ করতে সক্ষম হবে।

উৎস ঃ শ্রীঅরবিন্দ— দ্য আওয়ার অব গড অ্যান্ড আদার রাইটিংস। লেখক অরবিন্দ ঘোষ।

ফ্রাঞ্জ বপ্ (১৭৯১-১৮৬৭)

ইনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম ভাষাতত্ত্ববিদ। জার্মানির বার্লিন

বিশ্ববিদ্যালয়ে এশিয়ান কালচার এবং ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সংস্কৃতকে ভিত্তি করে আধুনিক ভাষা বিকাশের ওপর বিস্তৃত গবেষণা করেন। তিনি ফেড্রিক শ্লেজেলের প্রধান শিষ্য। তিনিই ইউরোপে প্রথম তুলনামূলক ভাষাচর্চার কাজ শুরু করেন। তাঁর অন্যতম অবদান হলো সংস্কৃত, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষার ওপর তুলনামূলক বিশ্লেষণ। তিনি সংস্কৃত, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় ব্যাকরণকোষ সম্পাদনা করেন। তাঁর কাজ পরবর্তীকালে ম্যাকস মুলার, মাইকেল ব্রিল, ফার্ডিনান্ড দ্য সাসুবে, লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড এবং জেকবসনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

উদ্ধৃতি ঃ সংস্কৃত ভাষার সৌন্দর্য শুধুমাত্র পণ্ডিত বা পুরোহিতদের কাছে নয়, তা ছিল সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের মুখের ভাষা। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতেই পারি যে, যে জাতির ভাষা সুদূর অতীতে এত পরিশীলিত ছিল, সেই জাতি নিশ্চয় তার প্রাচীন সাহিত্যের জন্য গর্ববোধ করতে পারে।

উৎস ঃ অ্যানালিটিক্যাল কম্পারিসন অব দ্য সংস্কৃত, গ্রিক, ল্যাটিন অ্যান্ড টিউটনিক ল্যাঙ্গুইজেস— ফ্রাঞ্জ বপ্।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি
সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী, নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক)
অনুবাদক : ডা: রবীন্দ্রনাথ দাস

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

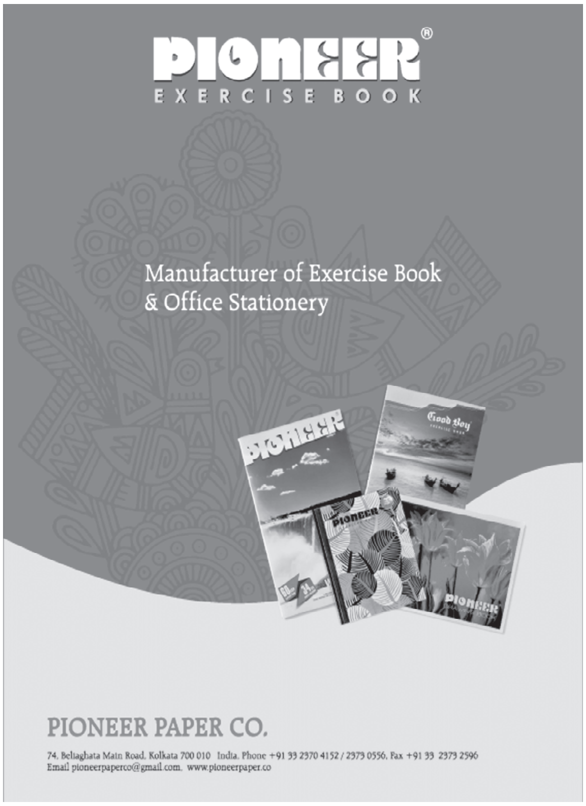

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

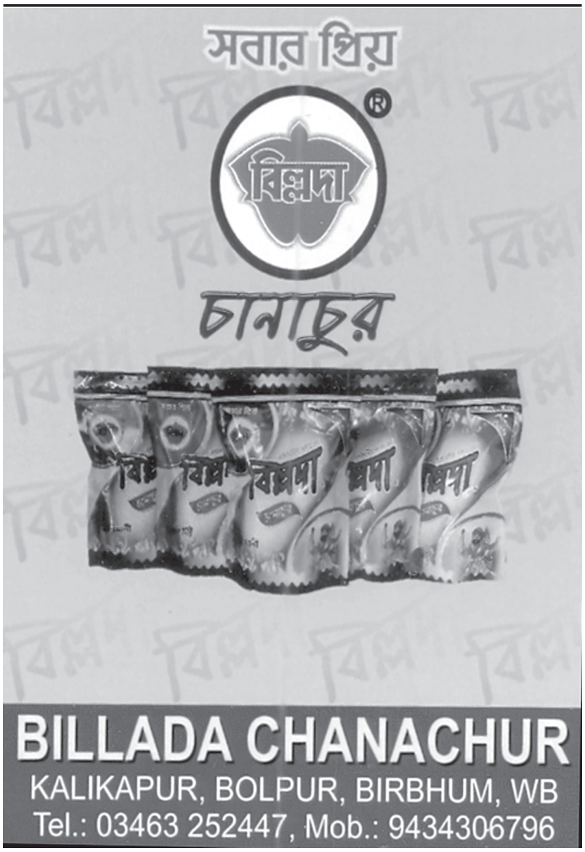

অন্য জীবনানন্দ

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

মাত্র মাসাধিককালের ব্যবধানে রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের বাংলা ভাষার প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশের ১২০তম জন্মদিন (৬ ফাল্গুন, ইংরেজি ১৮৯৯)।১৯৪১ সালে রবীন্দ্র প্রয়াণের সময় জীবনানন্দের একমাত্র মুখে-ফেরা কাব্যগ্রন্থ বনলতা সেন সিগনেট প্রেস থেকে সবে প্রকাশের মুখে। ইতিমধ্যেই ঝরাপালক (১৯২৮), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬) প্রকাশের সুবাদে মৃত্যুবিলাসী দুর্বোধ্য কবির তকমা তাঁর গায়ে সেঁটে যাচ্ছে। জীবনানন্দের কাব্য সমালোচনা এ লেখার উদ্দিষ্ট নয় এবং অধিকার বহির্ভূততও হয়তো। তবে তাঁর কবিতার উল্লেখ ব্যতিরেকে তাঁর আলোচনা অবান্তর।

আমরা যথার্থ কবি বলতে সচরাচর যে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসীন বিকল্প জগতের মানুষের কোনও অবয়বের ধারণা পাই, তা বহুলাংশে জীবনানন্দের মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও তাঁর ব্যবহারিক জীবন ছিল নিতান্ত সমস্যাসঙ্কুল। বলা যায় কিছুটা কবিতা সৃষ্টির প্রতিকূল। পূর্বকথার আলোচনায় পাওয়া যায় জীবনানন্দ জন্মেছিলেন একটি সম্পূর্ণভাবে আচারনিষ্ঠ নিরাকার ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্রাহ্মপরিসরে। পিতা ছিলেন শিক্ষক ও দেবেন্দ্রনাথের অনুসৃত ব্রাহ্ম ধর্মের তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার বরিশালের প্রধান পরিচালক সত্যানন্দ দাস। তাঁর মায়ের নাম তুলনায় বেশি পরিচিত কুসুমকুমারী দাস। মায়ের স্বভাবকবি হওয়ার উত্তরাধিকার জীবনানন্দে বর্তেছিল একথা সমসাময়িকরা বলে গেছেন। বরিশালের অপরূপ নৈসর্গের অভ্যন্তরে জন্ম হওয়ায় জীবনানন্দের মধ্যে যে প্রকৃতিপ্রেমের বীজ ছিল তাই উত্তরকালে তাঁর কাব্যকৃতির বিকাশের বড় সহায়ক হয়েছিল। সে সময়ের বরিশাল ছিল শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি গর্ব করার মতো নাম। এখান থেকেই এসেছিলেন মহাত্মা স্বদেশপ্রেমিক অশ্বিনীকুমার দত্ত। জীবনানন্দ এই অশ্বিনীকুমারের পিতার নামাঙ্কিত বিখ্যাত ব্রজমোহন স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন। বাড়িতে ধর্মীয় পরিবেশ ও ব্রাহ্ম অনুশাসনের রীতি অনুযায়ী অতি প্রত্যুযে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পিতা সত্যানন্দের উপনিষদ থেকে উদাত্ত কণ্ঠের পাঠ ও সূর্যচেতনার ব্যাখ্যা জীবনানন্দের জীবনে দার্শনিকতার উন্মেষের সূচনা লগ্ন। তাঁর মা এই সময় সুমধুর কণ্ঠে ধর্মীয় গান করতেন। বৃহৎ সংসারে ছিল অনেক পরিচারক, পরিচারিকা। যাদের কাছে বাঙ্গালার প্রাচীন লোককথা, প্রচলিত কাহিনি, বেহুলা-লখিন্দরের রোমাঞ্চকর ও ট্র্যাজিক উপাখ্যান কিশোর জীবনানন্দের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। রূপসী বাংলা কবিতা পড়লেই দেখা যাবে 'যেইখানে একদিন শঙ্খমালা, চন্দ্রমালা মানিকমালার কাঁকন বাজিতে, আহা কোন দিন বাজিবে কি আর।' এমন মেদুরতাময় কবিতার সঙ্কেত ছিল সেই গল্প শোনা শৈশবে। কিংবা 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতায় 'বেহুলাও এক বিচ্ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায় বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।' সেই শিশুকালে শ্রুত বেহুলার অনুষঙ্গ ফিরে এল। সঙ্গে পৌরাণিক ইন্দ্র দেবতাও অনুক্ত রইলেন না। এক বিশেষ ঘরানার বুদ্ধিজীবী জীবনানন্দকে একটি মাত্র রঙে তৎকালীন দিনে fashionable ধর্মবিরোধী অত্যাধুনিক কবি হিসেবে চিহ্নিত করে নিজের সমগোত্রীয় হওয়ার আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছেন। বাস্তবে জীবনানন্দ অত সহজবোধ্য ও সরলরৈখিক বিচারের মানুষ আদৌ ছিলেন না।

বুদ্ধদেব বসু

বরিশালের পাঠ শেষ করে জীবনানন্দ কলকাতার ভালো ছাত্রদের প্রায় বাধ্যতামূলক উচ্চশিক্ষার বিদ্যাপীঠ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্সের স্নাতক হিসেবে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২১ সালে এম.এ পাশ করেন। কিন্তু আধা সাহেব হয়ে বেরোননি। তারপর শুরু হলো কর্মজীবন। আগেই বরিশালের প্রকৃতিকে দূরে সরাতে হয়েছিল বটে, কিন্তু সেখানে ফেরার অমোঘ আকর্ষণ তিনি অন্তরে লালন করতেন। কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করলেন। ১৯২২ থেকে ১৯৫৪-য় মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছ'টি কলেজে পড়াতে গেছেন। তার মধ্যে

তৎকালীন দিনে সুদূর দিল্লির রামযশ কলেজও (১৯৩০-৩১) বাদ যায়নি। যদিও ব্রজমোহন কলেজ বরিশালে (১৯৩৫-৪৮) তাঁর কবি জীবনের সেরা সময় অতিবাহিত হয়েছিল। একটা সময় দৈনিক স্বরাজের সাহিত্য সম্পাদক ও দ্বন্দ্ব পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেন।

বন্ধু-কবি ও একান্ত অনুরাগী বুদ্ধদেব বসু লিখছেন— 'জীবনানন্দ তাঁর কবি জীবনের আরম্ভ থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত অসূয়াসম্পন্ন নিন্দার দ্বারা এমনভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন যার প্রভাবে তাঁর জীবিকার ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটেছিল। তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতাটিকে অশ্লীল অভিযুক্ত করে কলকাতার কলেজের এক অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা থেকে অপসারিত করেন। অবশ্য প্রতিভার গতি কোনও বৈরিতার দ্বারাই রুদ্ধ হতে পারে না এবং পৃথিবীর কোনও John keats বা জীবনানন্দ নিন্দার ঘায়ে মূর্চ্ছা যাননি।' জীবনানন্দের কাব্য উৎকর্ষতাকে উদ্ভাসিত করেছিলেন বুদ্ধদেব।

জীবনানন্দ যখন অধ্যাপক জীবন ও তাঁর কাব্য রচনা যুগপৎ জারি রেখেছিলেন তা তাঁর অবিরত চাকুরিস্থল পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দেখলে যথেষ্ট বিস্ময়কর মনে হয়। সেই ইংরেজ আমলের বিদ্যায়তনগুলিতে এখনকার মতো উচ্ছৃঙ্খলতা না থাকায় শিক্ষকদের নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে হতো। মাঝে মধ্যে কলেজে গিয়ে liberal arts-এর প্রায় অনিচ্ছুক পড়ুয়াদের দায়সারা ভাবে ক্লাস নিয়ে রাজনীতি বা পার্টটাইম কবিগিরির পরিস্থিতি ছিল না। জীবনানন্দের মতো আদ্যন্ত নীতিনিষ্ঠ, রোমান্টিক অতি সংবেদনশীল মানসিকতার মানুষটি এই প্রতিকূল, সদা-অনিশ্চিত কর্মজীবনের বিক্ষুব্ধতার মধ্যে কবি মনটিকে সযত্নে সংরক্ষিত রাখতে আশঙ্কিত ছিলেন। একটা কথা বলা জরুরি, জীবনানন্দের কবিতায় একদিকে ছিল নির্জন বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলের অপরূপ মায়া ও তজ্জনিত প্রকৃতির মধ্যে অনন্তকাল বহমান সময়ের ধারার আধ্যাত্মিক অনুরণন। অন্যদিকে ছিল নগরবাসী জীবনানন্দের কলকাতার প্রতি অনুরাগ 'এই পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা সত্য, তবু শেষ সত্য নয়। কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে'। সঙ্গে রয়ে গেছে মানুষের ওপর অগাধ বিশ্বাস 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।' তদন্তকারীর উৎকীর্ণতায় আবিষ্কার করতে চেয়েছেন কলকাতাকে 'ভিখিরী' কবিতায়। নিশুতি রাতে ঘুরেছেন কলকতার পথে 'একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়, একটি পয়সা আমি পেয়েছি বাদুড়বাগানে, একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি পাথুরে ঘাটায়' কিংবা আমিও ফিয়ারর্স লেন ছেড়ে দিয়ে হঠকারিতায় মাইল মাইল পথ হেঁটে দাঁড়ালাম বেন্টিক স্ট্রিটে গিয়ে টেরিটি বাজারে... (রাত্রি)।

এখানেই আবার ইট কাঠ পাথরের নিবিড় সহাবস্থান কিন্তু 'তিলোত্তমার কবির' অরুচিকর মনে হলো। 'নগরীর মহৎ রাত্রিকে' তার মনে হয় লিবিয়ার জঙ্গলের মতো— তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।' এই বৈপরিত্য অব্যাহত ছিল। সেই সময় গ্রাম ও শহরবাসীর অনুপাত ছিল আনুমানিক ৮৫ : ১৫। চাকুরেরা সারা সপ্তাহ কলকাতার মেসবাড়িতে কাটিয়ে সপ্তাহান্তে দেশের বাড়িতে ফিরে যেতেন। অনেকে যেতেন মাসান্তে। জীবনানন্দও হ্যারিসন রোড ও ঠনঠনে কালীবাড়ির কাছে বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে দীর্ঘদিন মেসজীবন কাটিয়েছেন। এরই প্রতিফলনে তাঁর কবিতায় দুটি সমান্তরাল জীবনানন্দকে মাঝে মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়।

হ্যাঁ! আমরাই আপনাকে দিতে পারি
এক উন্নতমানের পরিষেবা
কারণ
আমাদের কাছ থেকে আপনি পাবেন

MUTUAL FUNDS Sahi Hai

OUR PRODUCTS	OUR PLANNING
❖ Portfolio Management Services	❖ Retirement Planning
❖ Mutual Fund	❖ Pension Fund
❖ Life Insurance	❖ Children Education Fund
❖ General Insurance	❖ Daughter Marriage Fund
❖ Mediclaim	❖ Estate Creation
❖ Accidental Insurance	❖ Wealth Creation
❖ Company Bond & Fixed Deposit	❖ Tax Planning

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা
১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত
SIP তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন
তাদের প্রত্যেকের ফাণ্ড ভ্যালু বর্তমানে ১ কোটি টাকা
২০ বছরে মোট বিনিয়োগ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মাত্র

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook
E-mail : drsinvestment@gmail.com
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

হ্যারিসন রোডের বাঙ্গালি সত্যান্বেষী

সন্দীপ চক্রবর্তী

বাঙ্গালির চায়ের আড্ডায় মাঝে মাঝেই একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে ঝড় ওঠে। কে বড়ো, ব্যোমকেশ বক্সী নাকি কিরীটী রায়? কিরীটী রায় নাকি ফেলু মিত্তির? বলা বাহুল্য, সিনেমাওয়ালারা এই ঝড়ের পরিপূর্ণ সুযোগ নেন। যার ফলে ইদানীং বাংলা ছবি মানেই ডিটেকটিভ থ্রিলার।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, এই লেখায় অন্য কেউ নেই। শুধুই ব্যোমকেশ বক্সী আছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি এই বাঙ্গালি সত্যান্বেষী গত আট দশক ধরে পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন। গেয়েন্দাগিরি করলেও ব্যোমকেশ গোয়েন্দা নন। ডিটেকটিভ তো ননই। কারণ শব্দ দুটি তার কাছে অবমাননাকর। বস্তুত ব্যোমকেশের স্বকীয়তার শুরু তার এই আত্মাভিমান থেকে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগের লোক হয়েও সে ইংরেজের দেওয়া ডিটেকটিভ পরিচিতিকে হেলায় বর্জন করতে পারে। নিজের পরিচয় দেবার সময় সে বলে, সত্যান্বেষী। অর্থাৎ সত্য অন্বেষণ করা যার পেশা। এই ব্যাখ্যা কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। তাতে ব্যোমকেশের কিছু যায় আসে না। সব থেকে বড়ো কথা, ব্যোমকেশ ধুতি পাঞ্জাবি পরে। চারিত্র ও লক্ষণ হারিয়ে ফেলার ব্যাপারে বাঙ্গালির খ্যাতি আছে। ইংরেজিয়ানা রপ্ত করায় বাঙ্গালি যে মুনশিয়ানা দেখিয়েছে সেরকম বোধহয় আর কেউ পারেনি। কিন্তু শরদিন্দু কুয়োয় বন্দি কলমচি নন। তাঁর একটা ভারতীয় সত্তা রয়েছে (যার পরিচয় তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে পাওয়া যায়)। সুতরাং তাঁর ষোলো আনা আস্থা বাঙ্গালিয়ানায়। সেইজন্য ব্যোমকেশ ধুতি পাঞ্জাবি পরে, পায়ে গলায় পাম্পশু, সাবেকি খুর দিয়ে দাড়ি কামায় এবং বন্ধু অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ের বাসা উঠে গেলে তাকে হ্যারিসন রোডের নিজের বাসায় থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। একে কী বলব, বসুধৈব কুটুম্বকম্? হয়তো তাই। ততটা যদি নাও হয়, বন্ধুকৃত্য তো বটেই।

শরদিন্দুর একটি ছোটো গল্প আছে, নাম 'প্রিয় চরিত্র'। গল্পটি বেশ অদ্ভুত। গল্পের কাহিনিটি এই রকম : শরদিন্দু-সৃষ্ট নানা চরিত্র তার কাছে এসে জানতে চায় কে লেখকের প্রিয় চরিত্র? লেখক এক মারাত্মক দোটানায় পড়ে যান। কে তার প্রিয় চরিত্র? সকলকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন। সেই হিসেবে সকলেরই তার প্রিয় চরিত্র হওয়া উচিত। কিন্তু শরদিন্দু পলিটিক্যালি কারেক্ট হতে চান না। ব্যোমকেশ তার প্রিয় চরিত্র। কথাটা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। সুতরাং গল্পের পরিণতিতেও আমরা তাই দেখব। তিনি স্বীকার করবেন, হ্যাঁ, ব্যোমকেশ আমার সব থেকে প্রিয় চরিত্র।

ব্যোমকেশের মাধ্যমে শরদিন্দু ডিটেকটিভ কাহিনিকে সাহিত্যের জাতে তুলেছিলেন। তার আগে কেমন ছিল বাংলার গোয়েন্দা কাহিনি? রবীন্দ্রনাথ নিজে 'ডিটেকটিভ' নামের গল্প লিখেছেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে অধ্যাত্মনিবিড় ভাবরাজ্যে তাঁর বসবাস সেখানে খুন-জখম একেবারেই খাপ খায় না। পাঁচকড়ি দে-র নীলবসনা সুন্দরীতে আমরা পেয়েছিলাম গোয়েন্দা দেবেন্দ্র বিজয়কে। তিনি সে সময় যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিলেন। ঝাঁকামুটের মাথায় চড়ে কলকাতার ঘরে ঘরে বিকোত নীলবসনা সুন্দরী। কিন্তু উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রচনা পাঁচকড়ি দে-র উদ্দেশ্য ছিল না। বস্তুত গোয়েন্দা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

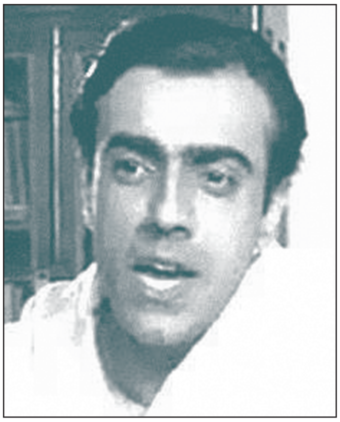

ব্যোমকেশরূপী রজত কাপুর

কাহিনিও যে সাহিত্য হতে পারে, সেই ধারণাও তখন তৈরি হয়নি। তার রচনায় চমক ছিল। সুতরাং জনপ্রিয় হতে তার আটকায়নি। তবে যে সব মালমশলা থাকলে একটি রচনা নিজের কাল পেরিয়ে পরবর্তীকালেরও সম্পদ হয়ে ওঠে সেরকম কিছু 'নীলবসনা সুন্দিরী'তে ছিল না। যার ফলে পাঁচকড়ি দে এই যুগে উপেক্ষিতই থেকে গেছেন।

শরদিন্দু প্রতিভাবান লেখক। তিনি প্রথম থেকেই চলতি ধারাকে অগ্রাহ্য করে ব্যোমকেশকে আবহমানের প্রেক্ষাপটে গড়তে চেয়েছেন। যাতে সে নিজের সময়কে চিহ্নিত করার সঙ্গে নিজের সময়কে অতিক্রমও করতে পারে। তার খুরধার মস্তিষ্ক, অপরাধীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান কৌশল উদ্ভাবনের ক্ষমতা তাকে দারুণরকম আধুনিক করে রেখেছে। সাধু ভাষায় লেখা ব্যোমকেশের গল্প পড়বার সময় কখনও মনে হয় না গল্পগুলো পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে লেখা। যার ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঙ্গালি পাঠক ব্যোমকেশে বুঁদ হয়ে থাকে। মানতেই হবে ব্যোমকেশ শরদিন্দুর শ্রেষ্ঠ উপহার।

এমন একটি মহীরুহ উপহার না পেলে বাংলার গোয়েন্দা কাহিনি আজকের উচ্চতায় পৌঁছতে পারত না। ❙

প্রকৃতি পরিচয়

নবাঙ্কুর

গাছের ডাকাতি

ধীর শান্ত ক্ষমাশীল লোকের কথা বলতে হলে আমাদের দেশে গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়— 'তারোরিব সহিষ্ণুতা'। এমন যে শান্ত নিরীহ গাছ সেও নানারকম কৌশল করে, বিষ ঢেলে, ফাঁদ পেতে,হুল ফুটিয়ে কত উপায়ে যে দৌরাত্ম চালায় তা বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে পড়ে। শিকারি গাছেরা আশ্চর্য রকম ফাঁদ পেতে পোকামাকড় ধরে খায়। নানা রকম লোভ দেখিয়ে, রঙের ছটায় মন ভুলিয়ে পোকাদের ডেকে আনে, কিন্তু যারা আসে তারা আর ফিরে যায় না। মধু খেতে খেতে কখন যে তারা ফাঁদের মধ্যে গিয়ে পড়ে সেটা তাদের খেয়ালই থাকে না। কখন হঠাৎ টপ করে ফাঁদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা গাছের আঠাল রসে তাদের পা আটকে যায়, কিংবা ফাঁদের মধ্যে পিচ্ছিল পথে উঠতে গিয়ে আর উঠতে পারে না তখন বেচারাদের ছটপটানি সার। এরা মাংসাশী গাছ। পোকামাকড় খেয়ে এরা বেঁচে থাকে। এমনকী ছোটো ব্যাং ও টিকটিকিও এরা অনায়াসে খেয়ে ফেলতে পারে।

জঙ্গলের মধ্যে গাছে গাছেও লড়াই চলে। দিনের পর দিন নিঃশব্দে সে লড়াই চলতে থাকে। এক জায়গায় দশ-বিশটা গাছ থাকলেই তাদের মধ্যে কিছু না কিছু রেষারেষি বেধে যায়। সকলেই চায় প্রাণ ভরে আলো-বাতাস পেতে। সুতরাং যারা প্রবল তারা গায়ের জোরে সকলকে ঠেলেঠুলে বেড়ে ওঠে আর দুর্বল বেচারিরা আড়ালে অন্ধকারে শুকিয়ে মরে।

এক রকম গাছ আবার অন্য গাছের গায়ে পড়ে পাক দিয়ে ওঠে, তারপর তাদের চিপসে মারে। জঙ্গলের মধ্যে এক ধরনের লতা একাজে খুব ওস্তাদ। কেউবা আবার অন্য গাছের ঘাড়ে চেপে তাকে শেষ করে দেয়। আমাদের দেশের অশ্বত্থগাছ এবিষয়ে একেবারে ওস্তাদ। ছাদে, দালানে, পোড়ো বাড়ি বা মন্দিরে, অন্য গাছর ঘাড়ে, কারখানার চিমনির চুড়োয়, যেখানে সুযোগ

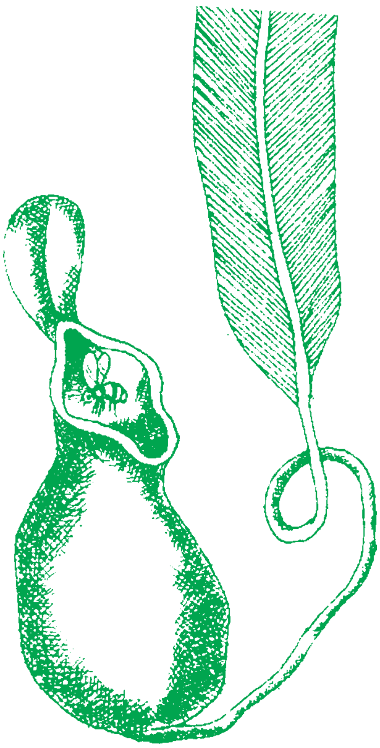

পাবে সেখানেই সে মাথা তুলে দাঁড়াবে। বটগাছও এব্যাপারে কিছু কম যায় না। নীচের গাছটিকে অল্পে অল্পে ফাঁস দিয়ে চেপে মারে। তারা বড়ো বড়ো তালগাছকেও কাবু করে ফেলতে পারে।

আর এক ধরনের গাছ অছে তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সবসময় তৈরি থাকে, পাছে কেউ তাদের ক্ষতি করে। মনসা গাছের গা-ভরা কাঁটা, জানোয়ারের সাধ্য কী তার কাছে ঘেঁষে! গোরু-ছাগল কত সময়ে ক্ষুধার তাড়নায় মনসা গাছে মুখ দিতে গিয়ে নাকে-মুখ কাঁটার খোঁচা খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে পালিয়ে আসে। মনসা জাতীয় গাছ নানা রকমের হয়। কিন্তু এক বিষয়ে সবাই সমান, সকলের গায়ে সজারুর মতো কাঁটা।

কাঁটাগাছগুলির কাঁটা এক এক সময়ে এমন সরু হয় যে, হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না। কাঁটাগাছ নানা রকমের হয়। তার মধ্যে কোনও কোনওটি শুধু কাঁটাতেই সন্তুষ্ট নয়, তারা কাঁটার মধ্যে বিষ ভরে রাখে। কাঁটার খোঁচা আর বিষের জ্বালা দুটোয় একসঙ্গে টের পাওয়া যায়। বিছুটি জাতীয় লতার কথা আমরা সবাই জানি।

ওল, কচুর কথা আমরা জানি। জঙ্গলের ধারে যখন বুনো ওলের নধর সবুজ পাতাগুলো ছড়িয়ে থাকে, তা খেলে যে গলা ধরবে তা গোরু-ছাগলে কী করে জানবে? এই সব পাতার মধ্যে ছুঁচের চাইতেও অতি সূক্ষ্ম দানা থাকে, সেগুলো গলায়, জিভে ফুটে মুখের অবস্থা সাংঘাতিক করে তোলে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপে এক রকরম বেত পাওয়া যায় তার পাতা খেলে গলা ফুলে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। এই বেতের নাম বোবা বেত।

আত্মরক্ষার জন্যই অধিকাংশ গাছ নানারকমের ফন্দিফিকিরের আশ্রয় নেয়। বংশরক্ষার জন্যেও তাদের যেসব উপায় খাটাতে হয় সেগুলিও কম সাংঘাতিক নয়। অনেক গাছের ফল বা বীজ কাঁটায় ভরা। সেগুলি নানা জন্তুজানোয়ারের গায়ে লেগে নানা জায়গায় গিয়ে পড়ে। এক একটা ফলের কাঁটার সাজ অনাবশ্যক রকমের সাংঘাতিক বলে মনে হয়। আর এক রকমের গাছ অছে, তাদের ফল পাকলে ফেটে যায় আর ভিতরের বীচিগুলো সব ছিটিয়ে পড়ে। কোনও কোনও গাছের এই বীজ ছড়ানোর কাজটি বেশ একটু জোরের সঙ্গে হয়।

ছেলেবেলায় এক রকম গাছের কথা পড়েছিলাম, তারা নাকি মানুষ ধরে টেনে খায়। আজকাল পণ্ডিতরা আর সেকথা বিশ্বাস করেন না। কারণ তাঁরা অনেক খোঁজ করেও সেরকম গাছের কোনও প্রমাণ পাননি। যে গাছ পোকামাকড় খায়, সে সুযোগ পেলে পাখিটা বা ইঁদুরটা পর্যন্ত হজম করতে পারে। কিন্তু সে যদি মানুষ খেতে আরম্ভ করে তাহলে তো আর রক্ষে নেই।

শ্যামল চক্রবর্তী

ভারতের পথে পথে

বেলুড়

দক্ষিণ ভারতে মন্দির স্থাপত্যে বৈচিত্র্যের স্বাদ মেলে কর্ণাটক রাজ্যের ইয়াগাচি নদীর তীরে ৯৭৫ মিটার উঁচু ছোট্ট শহর বেলুড়ে। ৮০০ বছর আগে শিল্প ও সংস্কৃতির পূজারি এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হোয়সল রাজাদের রাজধানী ছিল বেলুড়। আগে এর নাম ছিল ভেলাপুরী। তামিলনাড়ুর মন্দিরগুলির মতো এখানে গগনচুম্বী গোপুরম্ নেই, বিশাল বিশাল চত্বর রয়েছে। মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যে দর্শকরা আপ্লুত হন। ৪৪০ ৩৬০ ফুটের প্রঙ্গণে রয়েছে বিষ্ণুমন্দির — চেন্নাকেশব। হোয়সল স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন চোখে পড়ে এই মন্দিরের নির্মাণশৈলীতে। এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিল্পকর্ম বিশ্বের দ্বিতীয় কোনও সৌধে নেই। এছাড়াও এখানে রয়েছে গণেশ, দুর্গা,সরস্বতী, চেন্নিংগরায়া, বীরনারায়ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির। মার্চ-এপ্রিলে এখানকার 'কার ফেস্টিভ্যাল' চমকপ্রদ।

জানো কি?

- হকির জাদুকর বলা হয় ধ্যানচাঁদকে।
- ভারত ১৯৮০তে অলিম্পিকে হকিতে সোনা পায়।
- সোনাজয়ী সেই হকিদলের অধিনায়ক ছিলেন অজিত পাল সিংহ।
- ১৯১১ সালে আইএফএ-র শিল্ডজয়ী মোহন বাগান দলের অধিনায়ক ছিলেন শিবদাস ভাদুড়ী।
- গোষ্ঠপালকে বলা হতো চীনের প্রাচীর।
- ২০১৮ বিশ্বকাপ হকি অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভুবনেশ্বরে।
- পাঁচবার বক্সিংয়ে বিশ্বখেতাব পেয়েছেন মেরি কম।

ভালো কথা

মেনির ছানাদের শিকার শিক্ষা

পনেরোদিন আগে গোয়ালঘরে আমাদের মেনি দুটো বাচ্চা দিয়েছে। ঠাকুমা মেনি সমেত ছানাদুটো ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে রেখেছে। বাইরে যাওয়ার সময় হলেই মেনি ম্যাঁও ম্যাঁও করলেই ঠাকুমা মেনিকে বের করে দেয়। ঢেকে না রাখলে নাকি হুলোবেড়াল ছানাদুটো খেয়ে ফেলবে। এমনি করে ওরা বড়ো হয়ে সারা বাড়ি ছুটে বেড়াতে লাগলো। আমার সঙ্গে ওদের খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। একদিন দেখি মেনিটা একটা ইঁদুর আধমরা করে ছানাদুটোর সামনে রেখে একটু দূরে বসে রয়েছে। আর ছানাদুটো ইঁদুরটা নিয়ে খেলছে। ইঁদুরটা পালিয়ে যেতে চাইলেই ওরা দৌড়ে গিয়ে ধরে আনছে। ঠাকুমা বলল ওদের মা ওদের শিকার ধরার ট্রেনিং দিচ্ছে। বড়ো হলে তো ওদের নিজেদেরই শিকার করে খেতে হবে।

দিশা সেন, নবম শ্রেণী, নামোপাড়া, ঝালদা, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

আমার হিরো

শঙ্খশুভ্র দাশ, দশম শ্রেণী, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগনা।

মেদিনীপুরে বাড়ি তাঁর গ্রাম মহিষাদল
মুম্বইতে পড়াশোনা হাতেনাতে ফল।
অগ্নিপথ ফ্লপ হলেও মানেননি তিনি হার
পাগলু করে হয়ে গেলেন তিনিই সুপারস্টার।
তারপরেতে খোকাবাবু, কবির, চাঁদের পাহাড়
এগিয়ে গেলেন তরতরিয়ে ভাবনা কীসের আর!
আশা করি বুঝতে পারছ নামটি কী যে তাঁর
পদবিটা অধিকারী, পুরোটা বললাম না আর।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

পরীক্ষিৎ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পৌত্র এবং বীর অভিমন্যুর পুত্র। যুধিষ্ঠিরের পর তিনি হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসেন। মৃগয়া তাঁর বড় প্রিয় ছিল।

চলবে

পাকিস্তান প্রীতি কংগ্রেসিদের রক্তে

মণীন্দ্রনাথ সাহা

খবরে জানা গেল--- পঞ্জাবের রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দর সিংহ-ই ক্যাপ্টেন নামে পরিচিত। কর্তারপুর করিডর শিলান্যাসে সিধু গেলেও আমন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও অমরিন্দর যাননি। সেকথা মাথায় রেখেই সিধু মন্তব্য করেছেন, 'আমার ক্যাপ্টেন তো রাহুল গান্ধী। তিনি যেখানে যেখানে আমাকে পাঠিয়েছেন, সব জায়গাতেই গিয়েছি'।

কর্তারপুর করিডর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চলতি সপ্তাহে পাকিস্তানে গিয়েছেন নভজ্যোৎ সিংহ সিধু। নিজের 'পাকিস্তান প্রীতি' প্রমাণ করতে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও খালিস্তান পন্থী ও ভারত বিরোধী নেতা গোপাল সিংহ চাওলার সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছবিও তুলেছেন এই কংগ্রেস নেতা। তার কিছুদিন আগে সিধু পাকিস্তানে গিয়ে সেখানকার সেনাপ্রধানের সঙ্গেও কোলাকুলি করেছেন।

স্বভাবতই এনিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক উঠেছে। বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী সিধুকে গ্রেপ্তারের এবং এন আই এ তদন্তের দাবি তুলেছেন। বিজেপির মুক্তার আব্বাস নাকভি বলেছেন, 'এটা কোনও কমেডি শো নয়, সিধুকে সেটা মনে রাখতে হবে। পাকিস্তানের মাটিতে এ ধরনের কার্যকলাপ উপেক্ষা করা যাবে না'। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরসিমরত কউর বলেছেন, 'সিধু নাকি ভারতের থেকে পাকিস্তানে বেশি ভালবাসা পান।'

এই কার্যকলাপে সিধুর 'ক্যাপ্টেন' তথা রাহুল গান্ধী বা অন্য কংগ্রেসি নেতারা 'স্পিকটি নট'। 'স্পিকটি নট' বাঙ্গালি নেতৃত্ব। যাঁরা এবং যিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা বিজেপির কোনও নেতার মুখ দিয়ে কোনও কথা বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই টুইটারে তাঁদের মন্তব্যের ফুলঝুরি ছোটান তাঁরাও।

সিধুর কাণ্ডকারখানায় দেশের মানুষ আশ্চর্য হয়নি। কারণ এটাই কংগ্রেসি কালচার। তাদের মতো পাকিস্তান প্রেমী আর কেউ নেই। ইতিপূর্বে এক কংগ্রেসি নেতা বিজেপির সঙ্গে রাজনৈতিক টক্কর দিতে না পেরে পাকিস্তানে গিয়ে তাদের পায়ে ধরে বলেছিলেন— 'মোদী হটাও, হামে লাও'। ভাবখানা যেন পাকিস্তানের নেতারাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করে থাকে। তারও আগে জে এন ইউ-র কয়েকজন

সন্ত্রাসবাদী মনোভাবাপন্ন ছাত্র সন্ত্রাসী আফজল গুরুর ফাঁসির বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্লোগান দিয়েছিল— ''কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, ভারত তেরে টুকরো হোঙ্গে, ভারত কি বরবাদি জং রহেগা জং রহেগা'' বলে। তাদের সেই আন্দোলনের আসরে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন সিধুর ক্যাপ্টেন রাহুল গান্ধী, দেশ বিরোধী এবং চীনের স্তাবক সীতারাম ইয়েচুরি ও অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

রাহুল গান্ধীর কংগ্রেসের প্রাক্তন নেতারা এবং সীতারাম ইয়েচুরির দলের প্রাক্তন কমিউনিস্ট নেতারা উভয়ে মিলে অখণ্ড ভারতকে ত্রিখণ্ড করেছিলেন। তার ফলে পঞ্জাবের পঞ্চনদের এবং বাংলার পদ্মা, যমুনা, তিস্তা, মেঘনা, বুড়িগঙ্গার জল হিন্দুর রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল। সেদিনও যেমন ওই দুই দল ক্ষমতার লোভে দেশভাগ করেছিলেন, এখনও তাঁরা ক্ষমতার লোভে দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করে হিন্দু সমাজকে শেষ করে দিয়ে শাসনক্ষমতা দখল করতে চায়। যার জন্য দেশের শত্রুর সঙ্গে তাঁদের এত গলাগলি ভাব।

রাহুলের পরদাদা জওহরলাল নেহরু কাশ্মীর সমস্যা সৃষ্টি করে গেছেন। যার জেরে এখনও সমগ্র ভারতে রক্তক্ষরণ চলছে। তিনিই অসম থেকে তৈল সমৃদ্ধ সিলেটকে ছেঁটে ফেলেছেন এবং পূর্ববাংলা থেকে মুসলমানদের অসমে ঢোকার পথ প্রশস্ত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি মুসলমানদের একরকম ডেকে এনে বসিয়েছে কমিউনিস্টরা। এদের অত্যাচারে পশ্চিমবঙ্গবাসী আজ অতিষ্ঠ।

রাহুল-সীতারাম ইয়েচুরিরা চীন-পাকিস্তানের সাহায্যে আবার যদি বর্তমান ভারত খণ্ড বিখণ্ড করতে পারেন তাহলে হিন্দুদের অবস্থা কীরকম হবে তার একটা উদাহরণ দেশভাগের সময়কার ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে দিচ্ছি। দেশভাগের সময় পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান এবং প্রদেশে ভয়াবহ হিন্দু হত্যা হয়েছে। সেই দাঙ্গায় ব্রিটিশ সরকারের মতে একমাত্র পঞ্জাবেই ৬ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়েছিল। 'শিশুদের দু' পা ধরে দেওয়ালে আছাড় মেরে ফেলা হয়েছিল, মেয়েদেরকে ধর্ষণের পর স্তন কেটে নেওয়া হয়েছিল এবং গর্ভবতীদের গর্ভপাত করে দেওয়া হয়েছিল'।

'...6,00,000 of them were killed. But no, not just killed. If they were children, they were pickedup by the feet and their heads smashed against the wall. If they were girls, they were raped and then their breasts were chopped off. And if they were Pregnent, they were disembowelled. (Leonard Mosley : p. 279)

সরকারি হিসেবে নিহত ৬ লক্ষ; গৃহহারা ১ কোটি ৪০ লক্ষ, ধর্ষিতা নারী ১ লক্ষ; ধর্মান্তরিত বা নিলামে যে কত মেয়েকে বিক্রি করা হয়েছিল তারা কোনও সঠিক হিসেব পাওয়া যায়নি।

ভারত বিভাজনকারী এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা পুনরায় ভারতভাগে উদ্যত হয়েছে। এবার যদি তারা ভারতভাগে সফল হয় তাহলে ভারত আর গণতান্ত্রিক ভারত থাকবে না, হয়ে যাবে ইসলামি ভারত। আর হিন্দু বলে কোনও সমাজ অবশিষ্ট থাকবে না। ইসলামি আইন অনুসারে তখন সবাইকে করা হবে মুসলমান অথবা কোতল। তাই ভারত বিদ্বেষীদের এত পাকিস্তান প্রীতি। ▌

অন্য রকম

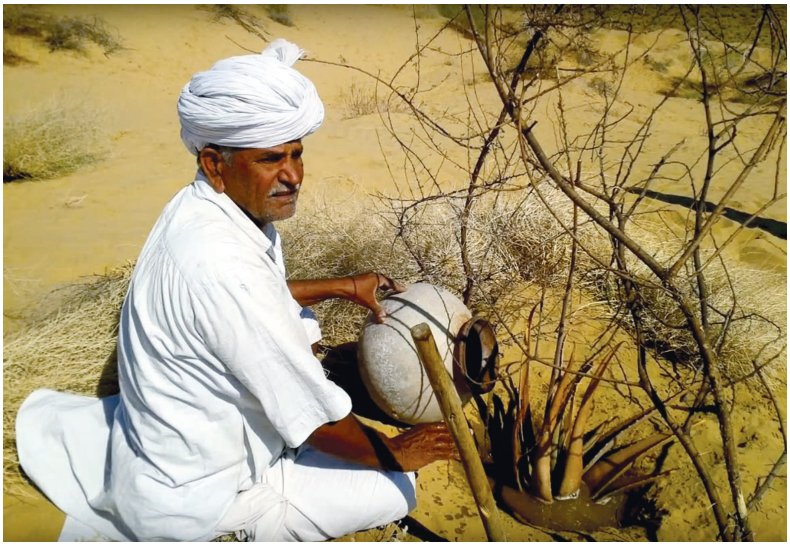

মরুভূমিতে সবুজের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সারা দেশ যখন নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে মাত্রাতিরিক্ত দূষণে আতঙ্কিত, ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের মরুভূমিতে তখন চলছে সবুজের অভিযান। এবং তাও একক প্রচেষ্টায়। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, কী করে একজন এমন অসম এক যুদ্ধে নেমে পড়তে পারেন!

রাজস্থানের বিশনোই সম্প্রদায়ের কথা অনেকেই জানেন। বনজ সম্পদ এবং প্রাণীসম্পদ রক্ষায় এই সম্প্রদায়ের মানুষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। রানারাম বিশোনি এই সম্প্রদায়ের একজন। সত্তরোর্ধ মানুষটি তার নিজের এলাকায় 'বৃক্ষপুরুষ' নামে পরিচিত। কিন্তু কেন এই অদ্ভুত নামকরণ? কারণ, রানারাম একক প্রচেষ্টায় চারপাশের মরু অঞ্চলে ২৭০০০ বৃক্ষরোপণ করেছেন। রানারামের প্রতিরোধের সামনে থমকে গেছে মরুভূমির আগ্রাসন। গত কয়েক দশক ধরে মরুভূমির আগ্রাসনের ফলে স্থানীয় চাষিদের বিপুল কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছুদিন আগেও যেখানে বালি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ত না, গাছ তো অনেক দূরের ব্যাপার সামান্য একগাছি ঘাসের দেখা মেলাও ছিল দুষ্কর— এখন সেখানে গেলে চোখে পড়বে সবুজের সমারোহ। চোখে পড়বে রানারামের লাগানো নিম, রোহিঙ্গা, কাঙ্কেরি খেজরি এবং বাবুলের সারি। মন ভরে যাবে বোগেনভিলিয়ার নরম লতানে ঝাড়ের বাহারে। কয়েক বছর ধরে রানারাম অসাধ্য সাধন করে চলেছেন। জলের উৎস স্থানীয় গ্রামের একটি কুয়ো। সেখান থেকে মাটির কলসিতে জল ভরে মাথায় করে সেই কলসি নিয়ে এসে জল দেন শেকড়ে শেকড়ে।

আগেই বলেছি রানারাম বিশনোয়ের এই প্রচেষ্টা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গোষ্ঠীগত পরিবেশবান্ধব পরিচিতি তো বিশনোইদের ছিলই, রানারাম তার সঙ্গে যোগ করেছেন একবিংশ শতাব্দীর দূষণবিরোধী ভাবনা। অনেকেরই হয়তো মনে পড়বে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত চিপকো আন্দোলনের কথা। এই আন্দোলন আর কিছুই নয় সম্পূর্ণ অহিংস উপয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। বৃক্ষরোপণের প্রথা বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিশোনিদের মধ্যে প্রচলিত। যদিও তখন একে আন্দোলন বলা হতো না। ১৭৩০ সালে বিশোনিরা যখন বৃক্ষরোপণ উৎসবে মগ্ন তখন স্থানীয় রাজার সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করে। রাজা ছিলেন গাছ কাটার পক্ষে, তাই এই অতর্কিত আক্রমণ। নারী পুরুষ ও শিশু মিলিয়ে সেদিন বিশনোই সম্প্রদায়ের ৩৬৩ জন মারা গিয়েছিলেন। এই ঘটনারই প্রতিবাদে গড়ে ওঠে চিপকো আন্দোলন। বিশোনিরা শুধু রাজস্থানে নয় পঞ্জাব হরিয়ানা উত্তর ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে। তবে সব জায়গাতেই তাদের চরিত্র এক। জঙ্গল এবং জংলি প্রাণীদের সুরক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়া। এ কাজে তারা কতটা দায়বদ্ধ? একটা উদাহরণ দিলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। ১৯৯৮ সালে সলমান খান শুটিং করতে গিয়ে একটি কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা করেন। বিশোনিরা খবর পেয়ে সলমন খানের গাড়ির পিছু ধাওয়া করে। সলমন গ্রেপ্তার হবার পর তারা নিবৃত্ত হন।

যাই হোক, আবার আমরা ফিরে যাব রানারামের কাহিনিতে। ব্যক্তিজীবনে তিনি সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ। মিডিয়ার প্রচারের আলো তার ওপর এসে পড়লেও, রানারামের মাথা ঘুরে যায় না। সততার সঙ্গে তিনি বলেন, 'পরিবেশ বাঁচানোর ভাবনা তো অবশ্যই মাথায় ছিল, তবে সেই সঙ্গে নিজের স্বার্থও ছিল। আমার জমিটা ছিল সবার সামনে। মরুভূমি যেভাবে এগিয়ে আসছিল তাতে আমার জমিটাই আগে নষ্ট হতো। তাই গাছ লাগিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলে নিজে যেমন বেঁচেছি, অন্যদেরও বাঁচিয়েছি।'

অদ্ভুত মানুষ রানারাম। সম্ভবত একবিংশ শতাব্দীর এই পৃথিবীতে তাকে মানায় না। জংলি জানোয়ারদের কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝেই তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। কখনও বলেন, 'পৃথিবীতে গাছ এবং অন্যান্য প্রাণীদের জন্ম মানুষের অনেক আগে হয়েছে। পৃথিবীর ওপর তাদের অধিকার আমাদের থেকেও বেশি। আমরা যদি তাদের সেই অধিকার ফিরিয়ে দিতে না পারি, ক্ষতি নেই। কিন্তু তাদের বেঁচেবর্তে থাকার পরিসরটুকু তো দিতেই পারি, তাই না?'

রানারাম আধুনিক পৃথিবীর সম্মিলিত বিবেককে জিজ্ঞাসা করেন। কোনও জবাব পান কি না তা অবশ্য কেউ জানে না।■

জেহাদি মৌলবাদের সিঁদুরে মেঘ কেরলের আকাশে

ড. জিষ্ণু বসু

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী চিন্তিত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো শবরীমালার আয়াপ্পা মন্দিরে সব বয়সের মহিলাদের প্রবেশ করানো এখনও সম্ভব হয়নি। তিনি আগামী ১ জানুয়ারি কাসাগোড়া থেকে তিরুবনন্তপুরম পর্যন্ত মহিলাদের মানববন্ধনের ডাক দিয়েছেন। সেই কার্যক্রমের নাম দেওয়া হয়েছে 'বনিতা মাভিল' মানে 'প্রমিলা প্রাচীর।' হিন্দুধর্মের বেয়াদপির বিরুদ্ধে তিনি খড়্গহস্ত। শতশত বছরের প্রথাকেও তিনি সিকি পয়সা খাজনা দেবেন না ঠিক করেছেন।

কিন্তু কেরলের বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রীর ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে এই রণংদেহী মূর্তি আজ হাস্যকর হয়ে উঠেছে। হিন্দুদের ক্ষেত্রে যেখানে বজ্র আঁটুনি সেখানে অন্যধর্মের ক্ষেত্রে একেবারেই ফস্কা গেড়োতে পরিণত হয়েছে। জেহাদি মৌলবাদের একেবারে আঁতুরঘর হয়ে উঠেছে দক্ষিণের ওই রাজ্যটি। সারা পৃথিবীর মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণের অবাধ ভূমি হয়ে উঠেছে পিনারাই বিজয়নের কেরল।

গত ৫ ডিসেম্বর পাঁচ সদস্যের একটি ফরাসি সন্ত্রাস-দমন শাখার গোয়েন্দা দল কেরলের কোচিতে পৌঁছেছে। ২০১৫ সালে প্যারিসে যে বোমা বিস্ফোরণে ১৫০ জন সাধারণ মানুষ প্রাণ হারায়, সেই ভয়ানক ঘটনার তদন্তেই এসেছিল এই ফরাসি দল। তারা বাইউর সেন্ট্রাল জেলে এক কয়েদিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছেন। ত্রিশূরের এই কারাগারে বন্দি আছে সুভানি হাজা মৈদিন। সুভানী আই এস আই- এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সুভানি এনআই-র কাছে স্বীকার করেছে যে, প্যারিসের বোমা বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত আবদেল হাহিদ আবাউড আর সালাহ আবদেমলাম তার সঙ্গেই ইরাকে আইএসের প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

আজ কেরলের সর্বত্র জেহাদি মৌলবাদের রমরমা। এই বৃদ্ধির সঙ্গে আন্তরিকভাবে যুক্ত ও ক্ষমতাসীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। এই ভস্মাসুর তৈরির ইতিহাস শুনলে সত্যিই গা শিউড়ে ওঠে। কেরলে সিপিএম সব সময়ই ছিল বর্ণ হিন্দুদের দল। উচ্চকুলশীল হিন্দু ছাড়া জেলাস্তরের উপরে স্থান পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু গত দশকে কংগ্রেসের সঙ্গে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আই ইউ এম এল)-এর রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা বামপন্থীদের চাপে ফেলেছে। পার্টি রাজ্যের মুসলমানদের দাবার বোড়ের মত ব্যবহার করতে চেয়েছে। এই কাজে তাদের সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয়েছে পিপলস ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (পি এস আই) এবং সোশ্যাল ডোমোক্রেটিক পার্টি অব ইন্ডিয়া (এস ডি পি আই)। সেই সময়ের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলতেন যে, কেরলে এমন হাজার হাজার বামকর্মী কাজ করছে যারা দিনে সিপিআই এমের পতাকা বইছে আর

রাত্রে পি এফ আই সংগঠনের কাজ করছে। এই অবাধ রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে কেরল হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী আই এস আই এসের সর্ববৃহৎ নিয়োগস্থল। যখন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা পিপলস ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার ভয়ানক গতিবিধির বিষয়ে বিজয়ন সরকারকে সতর্ক করল, তখন মুখ্যমন্ত্রী সোজাভাবেই জানালেন, যে তারা ওই সংস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবেন না। রাজ্যের বর্ষীয়ান সাংবাদিক বিআরপি ভাস্কর সেদিনই বললেন "সিপিএম সর্বদাই রাজনৈতিক দৃষ্টি থেকে মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলেছে। যাদের সঙ্গে যেভাবেই লোক ভিড় করে তাদেরকেই নিতে প্রস্তুত।"

পার্টির এই কেরল লাইন দেশের পক্ষে ভয়াবহ হয়ে উঠল। ২০০৯ সালে ভোটের প্রচারের অন্যতম মুখ হয়ে উঠলেন কে. টি. জালিল। জালিল বিজয়নের কেরল যাত্রার সর্ব সময়ের সঙ্গী হয়ে উঠলেন। এই জালিল কেরলের ইসলামিক মৌলবাদী সংগঠন সি সি র রাজ্যকমিটির সদস্য ছিলেন (The Indian Express, Jan. 12, 2009)। তার নির্বাচনী এলাকা কট্টিপুরম এলাকায় তাকে উগ্র মৌলবাদী নেতা হিসাবেই চেনে। জেতার পর বিজয়নের মন্ত্রীসভার মন্ত্রী হয়েছেন কে. টি জালিল। মন্ত্রী হয়েই কেরলে স্টেট মাইনরিটিস ডেভেলপমেন্ট ফাইনান্স করপোরেশন (KSMDFC) সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার বানিয়েছেন তার ভাইপো আদিবকে। কিন্তু একটা সরকারি সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার নিয়োগ কোনও সরকারি পদ্ধতি ছাড়া হতেই পারে না, সেটা কি মন্ত্রীমশাই জানতেন না?

আসলে ভোটে জেতার পরে সিপিএমের হার্মাদদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে অত্যাচার করেছিল এই জলিলের বাহিনী। মানে যারা দিনে সিপিএম আর রাত্রে পি এফ আই এর হয়ে কাজ করত। এই বাহিনী ভোটের পরে আর এস এস, বিজেপি, কংগ্রেস সব বিরোধী দলের সক্রিয় কর্মীদের নির্বিচারে হত্যা করেছে। এর আগে

রাজনৈতিক ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য পিনারাই বিজয়নরা কেরলকে জেহাদি সন্ত্রাসের আঁতুরঘর বানিয়েছেন। ভস্মাসুর আজ তার সৃষ্টিকর্তার মাথাতেই হাত দিতে বসেছে। কেরলের গ্রামে শহরে আবার ছড়াচ্ছে জেহাদি মৌলবাদের আগুন ঠিক খিলাফতের সময় যেমনটা হয়েছিল!

কেরলে 'পার্টি ভিলেজ' রীতি ছিল। যে গ্রামে সিপিআইএম ক্ষমতায় আছে তাকে পার্টি ভিলেজ বলা হতো। সেখানে বিরোধী মত প্রকাশ মানেই মৃত্যু। সেই গ্রামে সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করবে পার্টি। তাই বিরোধীরা সেখানে সিঁটিয়ে থাকে। কিন্তু এইবার বিধানসভা নির্বাচনের পরে হার্মাদ ও জেহাদিদের যৌথ বাহিনী পার্টি ভিলেজের বাইরেও অবাধে অত্যাচার করেছে। ২০১৬ সালের মে মাসে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৭ মাসে ১৭ জন আর এস এস বা বিজেপি কর্মীকে হত্যা করেছে এই যৌথবাহিনী। সেই সঙ্গে কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের কর্মীকেও হত্যা করেছে। কেরালা পুলিশ প্রায় দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল।

ক্যাম্পাস ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া হল মৌলবাদী পিপলস ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার ছাত্র শাখা। এবারে বিজয়ন জেতার পরে এস এফ আই আর ক্যাম্পাস ফ্রন্ট একসঙ্গে দৌরাত্ম্য করেছে। এই ক্যাম্পাস ফ্রন্ট ২০১০ সালের ৪ জুলাই এর্নাকুলাম জেলার নির্মলা কলেজের অধ্যাপক টি. জে. জোশেফের দুটি হাত কেটে দেয়। তার অপরাধ ছিল তিনি না জেনে প্রশ্নপত্রে মুসলমান ধর্মকে আঘাত করেছেন। সেই সময় রাজ্য সরকারের ভূমিকা ছিল অবাক করার মতো। সিপিআই এমের নেতৃত্বাধীন ভি. এম. অচ্যুতানন্দনের সরকার প্রায় কোন ব্যবস্থাই নেয়নি, ওই ভয়ানক মৌলবাদীদের শাস্তি প্রদানের। ক্ষোভে দুঃখে অধ্যাপকের স্ত্রী সালোমি (৪৮) আত্মহত্যা করেন। রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে একটু একটু করে শক্তি সংগ্রহ করেছে এই মৌলবাদী সংগঠনগুলি।

আজ ওই মৌলবাদী ভস্মাসুর নিজের স্বরূপ ধারণ করেছে। সিপিআইএম এই শক্তিকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগাতে চেয়েছে, পৌরমন্ত্রী করা হয়েছে ইসলামিক মৌলবাদের মুখ কে.টি.জালিলকে। এখন কিন্তু মৌলবাদী শক্তি আজ রাজ্য সরকারের কথায় কাজ করছে না। কোচিতে মহারাজা কলেজের রসায়নে স্নাতক স্তরের ছাত্র ছিল অভিমন্যু। ছেলেটি কলেজে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য বলেই পরিচিত। তাকে নৃশংসভাবে খুন করেছে কলেজ পরিসরের মধ্যেই। এখনও পর্যন্ত এই হত্যা মামলায় ধূর্ত বিলাল, ফারুক আর রিয়াজ সকলেই ক্যাম্পাস ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া বা পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার সদস্য।

ফরাসি গোয়েন্দা দলের আই এস আই এসের খোঁজে কোচিতে আসা আর জেহাদি মৌলবাদীদের হাতে ছাত্র মৃত্যু মোপালা হত্যাকাণ্ডের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা কীভাবে একটা সমাজকে মৌলবাদের গ্রাসে নিয়ে যায় কেরল দুটি ঘটনারই সাক্ষী রইল। ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্ব। তার সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ পেয়েছিল কেরলে। মোপালা মুসলমান দুষ্কৃতীরা ১৯২১ সালে মালাবারে ১ লক্ষ হিন্দুকে ঘরছাড়া করেছিল, হাজার হাজার মানুষকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল, শত শত মানুষকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল, গণধর্ষিতা হয়েছিলেন অগণিত হিন্দু মা-বোন। আজ রাজনৈতিক ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য পিনারাই বিজয়নরা কেরলকে জেহাদি সন্ত্রাসের আঁতুরঘর বানিয়েছেন। আজ ভস্মাসুর তার সৃষ্টিকর্তার মাথাতেই হাত দিতে বসেছে। কেরলের গ্রামে শহরে আবার ছড়াচ্ছে জেহাদি মৌলবাদের আগুন ঠিক খিলাফতের সময় যেমনটা হয়েছিল!

যুগাচার্য যবে সন্ন্যাস নিলেন

শেখর সেনগুপ্ত

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হতে পারলেই এক সময় মনে হবে, আমি যেন যুগাচার্যের সঙ্গ পাচ্ছি। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আমি তাঁর দ্বারা দীক্ষিত শিষ্য। গুরুঃ কে? শ্রীশ্রীগুরুগীতায় বলা হয়েছে :

মন্ত্ররাজমিদং দেবি গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
শ্রুতিবেদান্তবাক্যেন কুরু সাক্ষাৎ পরং পদম্।।

'গুরু' এই শব্দটাই এক মন্ত্র। শ্রুতিও বেদান্ত ব্যাখ্যায় গুরুই সাক্ষাৎ পরম পদ। কিন্তু আমাদের ঐহিক জীবনে একটি ধারণা মুর্হুমুর্হু প্রাধান্য পেয়ে থাকে এবং তা হলো এই যে, গুরুকে অবশ্যই সন্ন্যাসী হতে হবে। অন্যথায় তিনি আমাদের মতো সংসারবদ্ধ মানুষদের সমস্যার কোনও সুরাহা-দিশা দিতে পারবেন না। অথচ যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ সন্ন্যাস গ্রহণের অনেক আগেই বহু জনের নিকট গুরুরূপে মান্যতা পেয়েছিলেন। তাঁর মহাজীবনের চর্চা যখন করি, মনে এসে যায় অনাবিল আনন্দ এবং কিছু গূঢ় প্রশ্নের উত্তর। আজ থেকে দু' দশক আগে আমার সৌভাগ্য হয় প্রখ্যাত হোমিওচিকিৎসক ডাক্তার বিশ্বনাথ সেনগুপ্তর পরামর্শে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের তৎকালীন কাণ্ডারি স্বামী অরূপানন্দজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করবার। সে ছিল যেন আমার ও আমার সহধর্মিণীর প্রকৃত সাধর্ম লাভ। গুরুমন্ত্র বুকের মধ্যে অহরহ ধ্বনিত হয়। আমরা যেন স্বয়ং প্রণবানন্দজীর নিকটেই দীক্ষিত হলাম। বিমর্ষ হই এই ভেবে যে যুগাচার্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে অধিকাংশ বাঙালি আজও অনবহিত। সত্যি, আমরা বড়ো বিস্মৃতিপরায়ণ জাতি। আমরা আজ রাজনীতির মইকে অবলম্বন করে তাৎক্ষণিক প্রাপ্তির আশায় যত প্রকারের দুর্নীতি এবং হিংস্রতা সম্ভব, তাতেই মেতে উঠছি। একটা গ্রামপঞ্চায়েত নির্বাচনের নামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল নরমেধ যজ্ঞ— সরকারি হিসেব মোতাবেকই যেখানে বলির সংখ্যা সত্তরকে অতিক্রম করেছে! প্রণবানন্দজী রুখে না দাঁড়ালে কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গ নামক প্লাটফর্মটিও বাঙ্গালির জন্য নির্মিত হতো না। গোটা ভারতবর্ষকে যখন ধর্মভিত্তিক ভাগ করা হচ্ছে, তামাম বঙ্গকে তখন সেই অঙ্কেই জিন্নার পাত্রে তুলে দেবার বন্দোবস্ত পাকা। স্বামী প্রণবানন্দ তাঁর প্রিয় শিষ্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নির্দেশ দেন এই বিশাল আন্দোলন গড়ে তুলে হিন্দু বাঙ্গালিদের জন্য অন্তত এক খণ্ড পৃথক বঙ্গভূমির অবস্থানকে সুনিশ্চিত করতে। সেই ব্যাপক প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি এই পশ্চিমবঙ্গ। আমরা যারা বাগাড়ম্বরপ্রিয়, বারেকের জন্যও স্মরণে আনি সেই ঐতিহাসিক সত্যকে? আজ আমরা যখন জাতীয় এবং দলীয় পতাকা আন্দোলিত করি, তখন কী স্মরণ করি স্বামী প্রণবানন্দজীকে? আমরা অনুকরণপ্রিয়, রাজনৈতিক ভণ্ডামিতে ক্রমে এমন পোক্ত যে প্রায়শ গণতন্ত্রের নাভিশ্বাস ওঠে। মায়েরা, মেয়েরাও এই প্রবাহের শামিল। অসাম্য ভয়াবহ। সোনার দোকানে ঢুকে যাঁরা অক্লেশে সীতাহার, বাউটি, ঝুমকো কেনেন। তাঁরা কী একবারও পিছন ফিরে তাকান? এখনও যদি সচেতনতা না আসে, বংশানুক্রমে বাঙ্গালি পরিবারগুলি অধিকতর তমিদ্রায় নিমজ্জিত হবে।

যুগাচার্য সময়ের গুরুত্ব খুব বুঝতেন। এমনকী কখন তিনি নিজে সন্ন্যাস নেবেন, তার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছেন। পরিবেশ অনুকূল হলে তবেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন ১৯২৪ সন। জানুয়ারি মাস। অদৃশ্য চরকাবুড়ি মাঝে মাঝে বোনা সুতোর সাহায্যে কুয়াশা ছড়ায়। অন্য সময়ে পরিবেশ মনোরম। দেশের অন্য স্থানগুলি শীতঘুমে ডুবে থাকলেও প্রয়াগে বিপুল চাঞ্চল্য। পাঁচমিশেলি জনতায় একেবারে ঠাসাঠাসি। উপলক্ষ্য অর্ধকুম্ভ মেলা। যার যেমন সুবিধা, আশ্রয় খুঁজে নিচ্ছে। তাঁবু খাটিয়ে দেবার ঠিকাও নিয়েছে কিছু লোক। ব্রহ্মচারী বিনোদ ভুঁইয়া নদীর ধারে হাঁটছেন। তাঁকে পর্যায়ক্রমিক ভাবে অনুসরণ করছেন অনুগামীরা। হঠাৎই বিনোদের মনে হলো, সময় উপস্থিত,— তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত প্রায়। এখন, এই প্রয়াগেই রয়েছেন তাঁকে দীক্ষিত করবার জন্য উপযুক্ত সন্ন্যাসী। খুঁজে বের করা দরকার। তাঁকে বিনোদ শনাক্তও করতে পারলেন। সংখ্যাতীত তীর্থযাত্রীদের ভিড় এড়িয়ে এখানেও তিনি ধ্যানমগ্ন। এমন একজন, ---যাঁর নিখিল বোধ-বিদ্যা পরিমাপের বাইরে। অথচ থাকেন নিভৃতিতে। তিনি ক্ষমতা রাখেন বহুবিধ প্রতিহার্য অর্থাৎ মিরাকেল সৃষ্টিতে। কিন্তু ভিড় জমাতে নারাজ। তিনি স্বামী গম্ভীরনাথ গিরি। তরুণ বিনোদ আবেদন জানাতেই তিনি সম্মত। বিনোদ তাঁর নিকট সন্ন্যাস নিলেন। তখন থেকেই তিনি স্বামী প্রণবানন্দ।

লক্ষণীয় যে, প্রণবানন্দজী যাঁর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, তিনি কিন্তু একজন অজ্ঞাত পরিচয় সন্ন্যাসী। নদীতীরে বসে ছিলেন। প্রণবানন্দ তাঁকে দেখে থমকে দাঁড়ান। তারপর সোজা গিয়ে তাঁকে প্রণাম করেন। বছর কয়েক বাদে এক মাঘী পূর্ণিমায় কয়েকজন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস দেবার পূর্বক্ষণে বলেছিলেন, 'আমি যাঁর কাছে মাথা বিকিয়েছি, সেই বাবা গম্ভীরনাথ গিরি একজন অসীম যোগৈশ্বর্যশালী মহামানব— যাঁর ইচ্ছায় চন্দ্র সূর্য কক্ষচ্যুত হতে পারে।... তিনিই বলেছিলেন, ভগবৎকৃপার তিনিই পাত্র, যিনি ধর্মার্জনের পাশাপাশি অপরের সেবা করবার প্রবৃত্তিকে লালন করেন। শৈথিল্য বশে অথবা হেলাভরে কোনও কৃত্য যেন তোমার দ্বারা অনুষ্ঠিত না হয়।' ■

আমরা ভিক্ষা চাইছি না, সরকার রামমন্দির নির্মাণের রাস্তা প্রস্তুত করুক : ভাইয়াজী যোশী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'আমরা রামমন্দির ভিক্ষা চাইছি না। এটি আমাদের ন্যায্য অধিকার, কিন্তু সংসদ ও সরকারেরও দায়িত্ব বটে। বিচারব্যবস্থা ও আদালতের প্রতি আমাদের সম্মান রয়েছে কিন্তু বিচারব্যবস্থা ও সরকারি ব্যবস্থা উভয়েরই জনভাবনাকে উপেক্ষা না করে তাকে মর্যাদা দেওয়া

উচিত। আর বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সংকল্প ছিল মন্দির নির্মাণের।' গত ৯ ডিসেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আয়োজিত বিরাট ধর্মসভায় লক্ষ লক্ষ রামভক্তের সামনে কথাগুলি বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী ওরফে ভাইয়াজী যোশী।

বস্তুতপক্ষে সেদিন দিল্লিতে লক্ষ লক্ষ রামভক্তের উপস্থিতি দেশের হিন্দু জনমানসে ব্যাপক উৎসাহের সঞ্চার করে। এর আগে অযোধ্যা, নাগপুর, মুম্বই-সহ দেশের দু'শোর বেশি স্থানে রামমন্দির নির্মাণের জন্য জনজাগরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ঐতিহাসিক রামলীলা ময়দানের বিরাট ধর্মসভায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভিন্ন পদাধিকারী-সহ দেশের গণ্যমান্য সাধুসন্তরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সবারই বক্তব্য ছিল সরকারকে সমস্ত প্রকার বাধা দূর করে রামমন্দির নির্মাণের পথ প্রস্তুত করতে হবে। ধর্মসভার সভাপতি আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী অবধেশানন্দ গিরি বলেন, রামন্দির নির্মাণের দাবিতে দিল্লির এই জনসমুদ্র ইতিহাস রচনা করেছে। রাম ভারতবর্ষ তথা হিন্দু সমাজের চেতনা ও মুক্তিমন্ত্র। রামমন্দির নির্মাণের দাবিতে সমবেত জনভাবনাকে সরকার ও শীর্ষ আদালতের মর্যাদা দেওয়া উচিত। তিনি লক্ষ লক্ষ রামভক্তকে মন্দির নির্মাণের জন্য সংকল্পবাক্য পাঠ করান।

ধর্মসভায় মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী পরমানন্দজী মহারাজ বলেন, আমরা তোষামোদ করি না। সরকার যদি মন্দির নির্মাণের রাস্তা প্রশস্ত না করে তবে রামভক্তরা চুপ করে বসে থাকবে না। জগদ্গুরু রামানন্দাচার্য স্বামী হংসদেবাচার্য মহারাজ বলেন, রামমন্দিরের জন্য আইন বা অধ্যাদেশ ছাড়া আমরা অন্য কিছু স্বীকার করি না। শীর্ষ আদালতকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, রামমন্দির তাদের প্রাথমিকতার মধ্যে পড়ে না, তাহলে তাঁরা রামনবমীর ছুটি উপভোগ করেন কীভাবে?

গীতা মনীষী স্বামী জ্ঞানানন্দ মহারাজ বলেন, সাধুসন্তরা চাইছেন এই ডিসেম্বর মাসেই মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যাক। আরামবাগের উদাসীন আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ বলেন, সরকার যদি রামমন্দির নির্মাণের জন্য সংসদে আইন না করে তাহলে সংঘর্ষই একমাত্র রাস্তা থাকছে। দেশের শীর্ষ আদালত যদি দেশের জনভাবনাকে না বুঝতে পারে, তাহলে তা হিন্দুসমাজের প্রতি অন্যায়। সাধ্বী ঋতম্ভরা বলেন, দেশের হিন্দুসমাজ এখন জেগেছে, তাই মন্দির নির্মাণের রাস্তা পরিষ্কার করতে হবে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, দেশের জাতীয় রাজধানীতে এদিনের লক্ষ লক্ষ জনসমাগম দেশের বিচারব্যবস্থা ও সরকারকে ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছে যে, রামমন্দির নির্মাণের দাবিকে আর উপেক্ষা করা যাবে না।

ভারত-মার্কিন বায়ুসেনার দ্বিপাক্ষিক মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনী গত ১০ ডিসেম্বর কলাইকুণ্ডা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে 'কোপ-ইন্ডিয়া-১৮' শীর্ষক তৃতীয় পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক ১৩ দিনের মহড়ায় অংশ নেয়। এই উপলক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এয়ার অফিসার কমান্ডিং এয়ার কমোডোর সাজি অ্যান্টনি বলেন, দুই দেশের বায়ুসেনার মধ্যে অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি, কর্মকৌশলগত দক্ষতা বাড়াতে শ্রেষ্ঠ পন্থা-পদ্ধতিগুলির পারস্পরিক আদান-প্রদান করা এ ধরনের যৌথ মহড়ার উদ্দেশ্য। মার্কিন বিমানবাহিনীর আধিকারিক কর্নেল ড্যারেল ইন্সলে বলেন, ভারতীয় বিমানবাহিনীর পাইলটদের সঙ্গে বিমান ওড়ানো এবং একসঙ্গে প্রশিক্ষণ পরিচালনা তাঁর দেশের বাহিনীর কাছে এক অনন্য সুযোগ। 'কোপ-ইন্ডিয়া' মহড়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুই দেশের বিমানবাহিনীর কর্মীদের দক্ষতা এবং বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে বলে অভিমত প্রকাশ করে কর্নেল ইন্সলে বলেন, এ ধরনের মহড়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও বিনিময় জোরদার করতে কার্যকর হয়ে উঠবে। ভারত-মার্কিন যৌথ বায়ুসেনা মহড়া ২০০৪ সালে শুরু হয়। মহড়া চলাকালীন বিশেষজ্ঞদের মত বিনিময়, এয়ার মোবিলিটি ট্রেনিং, বিমান থেকে অবতরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, বিপুল সংখ্যায় কর্মী বিনিময়-সহ যুদ্ধবিমানের প্রশিক্ষণের মতো বিষয়গুলি প্রাধান্য পায়।

এবারের এই যৌথ মহড়ায় ১৪টি মার্কিন যুদ্ধবিমান সহ প্রায় ২০০ জন বায়ুসেনা কর্মী অংশ নিয়েছেন।

ধর্মীয় স্বাধীনতা বিপন্ন চীনে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কিছুদিন আগেই খবরের শিরোনামে এসেছিল, চীন পরবর্তী দলাই লামা নির্বাচন সেরে ফেলেছে এবং আমেরিকা এ নিয়ে ইতিমধ্যেই তার অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। এবার খবরে প্রকাশ পেল যে, চীনা পুলিশ গির্জার শতাধিক প্রার্থনাকারী ও এক ধর্মযাজককে ফাটকে পুরেছে। আন্তর্জাতিক মহলের সামনে এখন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, রাজনৈতিক দখলদারির স্বার্থেই দলাই লামা নির্বাচনে নিজেদের লোককে বসাতে চাইছে চীন।

তিব্বতে সাধারণ বৌদ্ধ নাগরিকদের ওপর চীনের কমিউনিস্ট সরকারের অত্যাচার চালানোর নজির দীর্ঘদিনের। এঁদের অত্যাচারে বর্তমান দলাই লামা পালিয়ে আসতে বাধ্য হন ভারতের অরুণাচলে। চীন দলাই লামার জায়গা ভরাট করতে বৌদ্ধ ধর্মগুরু হিসেবে পাঞ্চেন লামার পদ সৃষ্টি করলেও তিব্বতের নাগরিকদের থেকে বিশেষ সাড়া পায়নি। তিব্বতিরা এখনও মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, চীন তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের ওপর জুলুম করছে।

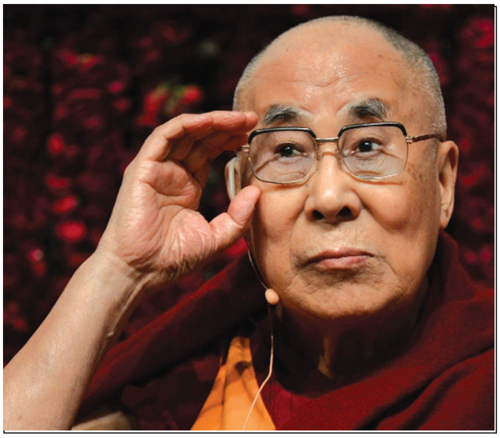

নিয়মানুযায়ী, বর্তমান দলাই লামা তাঁর পরবর্তী দলাই লামা মনোনীত করে যাবেন। কূটনৈতিক মহল মনে করেন চীন এই নীতি- নিয়মকে ধূলিসাৎ করে তাদের রাজনৈতিক দখলদারির স্বার্থে যে 'দলাই লামা'কে মনোনীত করবে, তিনি কেবল চীনের হাতের পুতুল হয়েই থাকবেন না, বৌদ্ধদের ধর্মবিশ্বাসেরও মর্যাদা দেবেন না। বিষয়টি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যখন চীনের চেঙডু শহরে বিখ্যাত প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জা আরলি রেনকোভমেন্ট চার্চ থেকে শতাধিক ভক্ত ও এক যাজককে গ্রেপ্তার করা হয় সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর।

চীনের সংবিধান অনুযায়ী ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি স্বীকৃত। কিন্তু তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিযোগ ছয় বছর আগে কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি জিং জিনপিং দেশের ক্ষমতায় আসার পর সাধারণের ধর্মীয় অধিকার খর্বের চেষ্টা হয়। বেছে বেছে রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করা যেতে পারে এমন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে 'স্বীকৃতি' দিয়ে বাকিদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। যার সাম্প্রতিকতম নমুনা রেনকোভমেন্ট চার্চ। কমিউনিস্ট আদর্শ মাফিক বিশুদ্ধ ধর্মাচরণকে এখন চীনে এক প্রকার অঘোষিত নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ফেলা হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে।

গির্জার গ্রেপ্তারি আন্তর্জাতিক দুনিয়াতেও বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। চীনের 'রাজনৈতিক দলাই লামা' বৌদ্ধদের ধর্মবিশ্বাসের আরও কতটা ক্ষতি করে, তাদের ধর্মভাব ভুলিয়ে দিয়ে চীনের রাজনৈতিক তাঁবেদারে পরিণত করে কিনা বিশ্বের আশঙ্কা আপাতত তা নিয়েই। তবে চীনে এই মুহূর্তে যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস চলছে, তার প্রভাব থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় যে বাদ পড়ছে না তা নিশ্চিত। বিশ্বশুদ্ধ মানুষ এ নিয়ে চিন্তিত হলেও এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য এখনও বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ শুনতে পাচ্ছে, এই হিমেল হাওয়ার মধ্যেও।

সাঁওতালি ভাষায় রচিত উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের মুখ্য টিকিট পরীক্ষক শ্যামসুন্দর বেসরা মর্যাদাপূর্ণ সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। সাঁওতালি ভাষায় রচিত 'মরম' উপন্যাসের জন্য তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে। সাঁওতাল পরগনার আর্থ- সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক ছবি তাঁর এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও, স্বাধীনোত্তরকালে সাঁওতাল পরগনায় অন্যতম দুটি শিল্পোন্নয়নের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। স্মরণে থাকতে পারে, স্বাধীনোত্তরকালে দুমকায় মাসাঞ্জোর বাঁধ এবং চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিন কারখানার মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ স্থাপনের ফলে শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। শ্রী বেসরার অন্যতম দুটি সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম 'দুল্লার খাতির' এবং 'দামিন রিয়া (উদাস) কাহানি কো' বর্তমানে সিধু কানহু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের অঙ্গ। সাঁওতালি ভাষায় জি বি রারেক নাম নিয়ে শ্রী বেসরা তাঁর সাহিত্যকর্ম রচনা করেন। হিন্দি ভাষায় সাহিত্যকর্ম রচনায় তিনি সাঁওতাল প্রাগানভি নাম নেন। হিন্দি সাহিত্য এবং সাঁওতালিতে তাঁর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে। সাহিত্যকর্মের জন্য রাজ্যস্তরে তিনি একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়াও, ১৯৯২ সালে ভারতীয় দলিত সাহিত্য অ্যাকাডেমি তাঁকে ড. আম্বেদকর ফেলোশিপ দিয়ে সম্মানিত করে। সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার জন্য আসানসোলের ডি আর এম তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা জানিয়েছেন। ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকেও তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপ্রচেষ্টাগুলিতে সাফল্য কামনা করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত দুই তিন বছর ধরে উত্তরবঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও সঙ্ঘের সহযোগী সংগঠনের কাজ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে শাসকদলের চোখ রাঙানি ও অত্যাচার শুরু হয়েছে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই শাসকদলের পায়ের তলায় মাটি ক্রমশ আলগা হচ্ছে। ফলস্বরূপ, প্রশাসন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ও শাখাগুলোর উপরে চাপ সৃষ্টি করে এলাকায় ভীতির সঞ্চার করছে। সম্প্রতি, উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিট স্কুলে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে পুলিশের গুলিতে দুই ছাত্র রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী এই মৃত্যুর ঘটনায় আর এস এস ও বিজেপির হাত দেখেছিলেন। অথচ ওই এলাকার তৃণমূল নেতা বলেছেন, পুলিশের গুলিতেই দুই ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। সিবিআই তদন্ত চেয়ে এখনও তাপস ও রাজেশের পরিবার

অপেক্ষা করছে ন্যায়বিচারের আশায়। দেশভক্তির শিক্ষা দেওয়া হয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। ইসলামপুরের নাম ঈশ্বরপুর করার জন্য বিদ্যাভারতী পরিচালিত একটি শিশুমন্দিরের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেশ বিরোধী জেহাদি ও কট্টরপন্থীদের বাড়বাড়ন্ত, এখন হামেশাই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতির পরিবেশকে বিনষ্ট করে চলেছে। আর ইসলামি মৌলবাদের এই উর্বর জমি বাংলাদেশি জঙ্গিদের সাহায্য করেছে। এখন মুসলমান দুষ্কৃতীরা জানে, অন্যায় কাজ করলেও ভোটব্যাঙ্কের জন্য পুলিশ তাদের কিছুই করবে না, বরং প্রয়োজনে তাদের আড়াল করবে। এমনি ঘটনারই সাক্ষী ছিল মালদা জেলার কালিয়াচক, যেখানে কয়েক হাজার মৌলবাদী জেহাদি প্রকাশ্য দিবালোকে থানায় অগ্নিসংযোগ করে মূল্যবান নথিপত্র ধ্বংস করে ও অস্ত্রশস্ত্র লুট করে হিন্দুদের বাড়িতে আক্রমণ করেছিল। আশ্চর্যজনক ভাবে তিনদিনের মধ্যেই থানা রঙ করে ঝা চকচকে হয়ে যায় এবং পুড়ে যাওয়ার চিহ্ন লোপাট করে দেওয়া হয়। রাজ্য সরকার একদিকে যেমন মুসলমানদের তোষণ করে চলেছে তেমনি সঙ্ঘের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি যাতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে না হতে পারে, তার জন্য প্রশাসন থেকে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ডালখোলা মাদ্রাসায় বোমা বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২ টার সময় ডালখোলা থানার ঝিটকিয়াতে এক আবাসিক মাদ্রাসায় গভীর রাতে বোমা বিস্ফোরণে চারিদিক কেঁপে উঠে।

সকালবেলা গ্রামের লোকজন ভেতরে ঢুকে দেখে, চারপাশে ছোটো বড়ো কাঁচ ও লোহার টুকরো পড়ে রয়েছে। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ থানায় অভিযোগ দায়ের করে। ফরোওয়ার্ড ব্লকের চাকুলিয়ার বিধায়ক আলি ইমরান রামিজ এবং রাজ্যের পঞ্চায়েত রাষ্ট্রমন্ত্রী গোলাম রাব্বানী এলাকা পরিদর্শন করে বলেন, এই ঘটনার পেছনে আর এস এসের হাত রয়েছে। কেননা কিছুদিন আগে তারা অল্প দূরেই সঙ্ঘের ক্যাম্প করেছে।

যেখানে মাদ্রাসাটি রয়েছে তার চারদিকে হিন্দু ও মুসলমানদের বাস। রাত্রি ১২টায় সময় বোমা বিস্ফোরণ ঘটলো অথচ পুলিশকে জানানো হলো পরদিন সকাল ৮টায়, এটি হলো কেন? তাছাড়া বোমা বিস্ফোরণ ঘটলো মাদ্রাসার ভেতরে আর বলা হচ্ছে বাইরে থেকে দুষ্কৃতীরা বোমা মেরেছে। তাহলে কি ধরে নেওয়া যায় না যে প্রমাণ লোপাট করার জন্যেই রাতের বেলায় মাদ্রাসা থেকে কোনও খবর পুলিশকে দেওয়া হয়নি। উত্তর দিনাজপুরের পুলিশকে এই বিস্ফোরণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে, তারা বিস্ফোরণের ঘটনাটিকে গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, শুনেছি একটা ছোটো বোম ফেটেছে, বাকি সব গুজব। অর্থাৎ প্রশাসন এই ঘটনাটিকে আড়াল করতে চাইছে। এখন পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। একটি ইংরেজি পত্রিকায় সঙ্ঘের বিরুদ্ধে বোমা বিস্ফোরণের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর, সঙ্ঘের পক্ষ থেকে এই মিথ্যা খবরের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানানো হয়।

উত্তর দিনাজপুরের পুলিশ সুপারের বক্তব্য শুনে বাংলা পত্র পত্রিকা বোমা বিস্ফোরণে খবর ছাপেনি। কিন্তু মাদ্রাসায় কীভাবে বোমা এলো, সেই তদন্ত করা দরকার নয় কি? নাকি মাদ্রাসার মধ্যেই বোমা মজুত ছিল, প্রশাসন তা জানবে কি? এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মাদ্রাসাগুলিতে অসামাজিক কার্যকলাপ হয় বলে বিবৃতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর তিনি ঢোক গিলে ভোটব্যাঙ্ক হারানোর ভয়ে সেই বিবৃতি তুলে নেন। এই ভাবে উত্তরবঙ্গের অনেক মাদ্রাসায় দেশবিরোধী শক্তির পালন পোষণ করা হচ্ছে ও আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চেষ্টা চলছে। সবচেয়ে উৎকণ্ঠার বিষয় হলো লাগামছাড়া তোষণ, হিংসার রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সাম্প্রদায়িকতা আগামীতে সঙ্ঘের পক্ষে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

কমেডিয়ান ভানু বাংলা সিনেমার সোনালি উপহার

দিলীপ পাল

একটা সময় বাংলা ছবিতে কমেডিয়ান হিসেবে দাপটে অভিনয় করে গিয়েছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২০ সালের ২৬ আগস্ট বাংলাদেশের ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয় জগতে নতুন যুগের সূচনা করেন ভানু ও জহর রায়। অসাধারণ অভিনয় গুণে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দর্শক-হৃদয়ে জয় করে নিয়েছেন তাঁরা দু'জন। সুচিত্রা-উত্তম, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল প্রমুখ শিল্পীর পাশাপাশি দাপিয়ে বেড়িয়েছেন ভানু-জহর জুটি। ভানুকে দেখলেই তো মানুষজন হাসতো। তখনকার দিনের একজন কমেডিয়ান হিসেবে অনেক সময়ই পুরো ছবিটাই ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় টেনে নিয়ে গিয়েছেন। তেমনই কিছু ছবি— 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ', 'পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্ট', 'মৃতের মর্তে আগমন', 'অদৃশ্য মানুষ', 'স্বর্গ মর্ত্য' '৮০তে আসিও না' 'ভ্রান্তি বিলাস' এবং মৃণাল সেনের 'কানামাছি'। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০০-র বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন। তবে ছবির জগতে আসার আগে ১৯২৮ সালে বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তর ক্ষুদে সহচর হিসেবে গুপ্তচরবৃত্তি শুরু। তারপর ১৯৪১ সালে অর্থ উপার্জনের জন্য চাকরিতে যোগ দেন। তারপর ১৯৪৩ সালে 'ঠাকায় গাড়োয়ান' নামে তাঁর প্রথম কমেডি গ্রামোফোন রেকর্ড রিলিজ হয়। এরপর ১৯৪৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সংগীত শিল্পী নীলিমা মুখোপাধ্যায় বাংলা ছবির জগতে আবির্ভাব ঘটে। একবার অভিনেত্রী কাবেরী বসুর দাদা এবং সবিতা চট্টোপাধ্যায়ের স্বামী গৌরাঙ্গ প্রসাদ রসরাজ অমৃতলালের হাসির নাটক 'চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্জ্যেকে সিনেমা করবেন বলে মনস্থির করলেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এ খবর শুনেই হাজির হলেন গৌরাঙ্গবাবুর সামনে। ভানুবাবু সরাসরি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন— আপনি নাকি হাসির ছবি করছেন? অথচ আমাকে ডাকেননি! এটা কেমন হলো? উত্তরে তিনি জানালেন, এটা আমার ছোটো বাজেটের ছবি। আমি আপনার অত পারিশ্রমিক দিতে পারবো না। ভানুবাবু বললেন— তাই! শুনলাম, আপনি নাকি জহরকে নিয়েছেন? গৌরাঙ্গবাবু বললেন, জহর আমার ছবির জন্য অনেক কম পারিশ্রমিক নিয়েছেন। তখন ভানুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন 'জহরকে কত পারিশ্রমিক দিয়েছেন? গৌরাঙ্গবাবু বললেন, আপনি পারিশ্রমিকের কথা শুনলে হাসবেন, জহরবাবুকে আমি পাঁচশো টাকা পারিশ্রমিক দিয়েছি। ভানুবাবু উত্তরে জানালেন, তাহলে আমাকে ছয়শো টাকা দেবেন, কিন্তু এই চরিত্রটি আমার চাই-ই-চাই। শেষ পর্যন্ত গৌরাঙ্গবাবু ভানুবাবুকে তাঁর ছবিতে নিতে বাধ্য হলেন। এরকম সব নাটকীয় ঘটনা অনেক আছে। অন্যদিকে, কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে বলেছিলেন, আমার দেখা ভানুবাবুর সেরা ছবিগুলোর কথা বললেই প্রথমেই মনে পড়ে যায় 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবির কথা, এ ছবিতে ভানুবাবুর একটা ডায়লগ ছিল— 'মাসিমা মালপো খামু'। এই সংলাপটি দর্শকদের হৃদয় জুড়ে বন্দি আছে।

ভানুবাবু ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল, অর্থাৎ এই ১১ বছরে দশবার দর্শকদের বিচারে সেরা কমেডিয়ান নির্বাচিত হয়েছিলেন। একটি সিনেমা পত্রিকা 'উল্টোরথ' (তখনকার দিনে নামি সিনেমা পত্রিকা) তাকে পুরস্কার দেয়।

১৯৮০ সালের ৪ঠা মার্চ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় পরলোকগমন করেন। বাংলা ছবির এক সোনালি অধ্যায় সেই সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। ■

সাপ্তাহিক রাশিফল

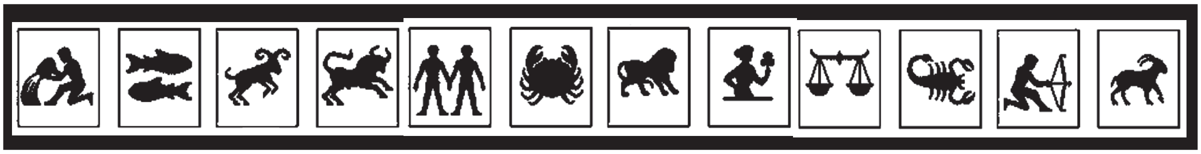

১৭ ডিসেম্বর (সোমবার) থেকে ২৩ ডিসেম্বর (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, তুলায় শুক্র, বৃশ্চিকে বুধ-বৃহস্পতি, ধনুতে শনি-রবি, মকরে কেতু, কুম্ভে মঙ্গল। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মীনে রেবতী নক্ষত্র থেকে মিথুনে অরুদ্র নক্ষত্রে।

মেষ : বিদ্যা, জ্ঞান, পুত্র, সম্পদ ও বুদ্ধিমত্তায় সামাজিক সখ্য ও জনমঙ্গল কর্মে আত্মীয়জ্ঞানে সেবা। বিদ্যার্থী, প্রতিবেশীর প্রতিযোগিতায় সাফল্য ও কর্মলাভ। নিকট ভ্রমণ। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি না থাকার সম্ভাবনা। কৃষি-জমি লাভ। মার্জিত রুচি, সুখাদ্য ভোজন ও সংস্কৃতি মনস্ক মানসিকতায় সময় অতিবাহিত হবে।

বৃষ : গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বাড়ি-গাড়ি তথা সম্পদ লাভ ও ব্যবসায় পার্টনারের কর্মলাভ ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। দু'জন বন্ধু থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। চলাফেরায় সাবধানতা অবলম্বন জরুরি। সন্তানের সাফল্য গর্ব ও আনন্দের বিষয়।

মিথুন : বাহনজনিত সতর্কতা আবশ্যক। অপ্রিয় সত্যের পরিবর্তে কৌশল ও সংযত বাক্য প্রয়োগে কার্যসিদ্ধি করুন। পেশাগত বদলি ও বিশিষ্টজনের সাহচর্যে সুখ ও আনন্দ, ক্রনিক রোগে কলুষিত মন ও অবসাদ। অগ্রজের উন্নতি, ফাটকায় শুভ।

কর্কট : বিষয়াসক্তি ও কৌশলী মন, রহস্যজনক কাজে প্রবণতা বৃদ্ধি। বস্ত্র, অলংকার ও পত্নী লাভ। শিল্পী-কলাকুশলী, প্রমোটার ও দলালি ব্যবসায় কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ। সন্তান ও বিদ্যার্থীর উৎকর্ষতা ও প্রতিভার স্ফুরণ। দুর্বল শ্রেণীর প্রতি মমত্ববোধ। পরোপকারে স্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক প্রশান্তি।

সিংহ : উত্তেজনা পরিহার ও শরীরের যত্নের প্রয়োজন। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্তি ও ভ্রমণের পদধ্বনি। নিজ বুদ্ধি ও বাক্‌চাতুর্যে নতুন সুহৃদ সম্পর্ক। খনি, অলংকার, বস্ত্র ও ওষুধ ব্যবসায় সুখী ও আভিজাতপূর্ণ জীবন লাভ। উদ্ভাবনী শক্তির স্বীকৃতি ও সংস্কৃতি মনস্কদের শংসা ও খ্যাতি।

কন্যা : সুস্থ শরীরে সুখ, সদ্ভাব, প্রতিপত্তি ও সম্মান লাভ। উদাস-অবসাদগ্রস্তদের আলোকবর্তিকায় উদ্ভাসিত করার যোগ্য ও তার বাস্তবায়ন সম্ভব। প্রিয়জনের বিবাহ ও ভ্রাতা-ভগ্নীর জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি ও সফল মনস্কাম। জীবন সঙ্গিনীর মৌলিক চিন্তায় ভাগ্যাকাশে নব-সূর্যোদয়।

তুলা : প্রেম, প্রণয় ও পত্নী রূপের সার্থক রূপায়ণ। কর্মক্ষেত্রে মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা। পিতৃস্থানীয়ের শারীরিক ক্লেশ মনঃকষ্টের কারণ। গৃহ সংক্রান্ত সমস্যায় উদারতার পরিচয় বাস্তবসম্মত। মিত্র ও ছিদ্রান্বেষী থেকে সতর্ক থাকা দরকার।

বৃশ্চিক : বিদ্যার্থী, গবেষক, শিক্ষক, ব্যারিস্টার, সাহিত্যিকদের চিন্তার মৌলিকত্ব, সৃজনশীলতা ও প্রতিভার দীপ্তির স্বাভাবিক প্রকাশে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। একাধিক পন্থায় আয়ের যোগ। কর্মে দায়িত্ব বৃদ্ধি। মাতার স্বাস্থ্যহানি, গৃহের শান্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। শির-বক্ষপীড়া ও সংক্রামক রোগ ভোগের সম্ভাবনা।

ধনু : জেদ ও ভাবাবেগ পরিহার করুন। আয়ের শ্লথ গতি। সহকর্মীর দূর অভিসন্ধি বুদ্ধিমত্তায় বানচাল করুন। উচ্চ শিক্ষায় প্রবাস। সম্পত্তি রক্ষার ব্যয় ও মানসিক অস্থিরতার অবসাদ। রমণীর লোভনীয় হাতছানি এড়িয়ে চলুন। নিম্নাঙ্গের পীড়ায় সর্তক থাকা দরকার।

মকর : গৃহকর্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতা ও সঠিক চিকিৎসায় বিলম্ব। সহৃদয় ও প্রতিবেশীর সহযোগিতা ও পেশাগত বদলির সম্ভাবনা। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানান্বেষণ, উচ্চশিক্ষার্থীর নতুন সুযোগ। এ সপ্তাহে বেকারদের কর্মলাভের সুযোগ। বয়স্ক মিত্র হিতকারী।

কুম্ভ : কর্ম, ব্যবসায় ও অভিজাত্য গৌরব। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ ও গর্ব। পিতার পরামর্শ ব্যবসায় সাফল্যের মাপকাঠি। পুলিশ, মিলিটারি, খেলোয়াড়, পরিবহণ ব্যবসা, রিপ্রেজেন্টটেটিভদের কর্মদক্ষতায় উজ্জল দীপ্তি।

মীন : গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, আত্মীয় সমাগম। বহু ব্যস্ততায় শারীরিক ও মানসিক চাপ উত্তেজনা, ক্রোধ পরিহারে নিজ ব্যক্তিত্ব বজায় রাখুন। লাইফ পার্টনার সাংসারিক সমৃদ্ধি বিকাশের সহায়ক। রমণীর সান্নিধ্যে উৎসাহ, সম্পত্তি ও বিলাসদ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ ও ব্যয়াধিক্য যোগ।

• জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।

—শ্রী আচার্য্য